নীললোহিত
সুদূর ঝর্ণার জলে

সুদূর ঝর্নার জলে

সুদূর ঝর্নার জলে

নীললোহিত
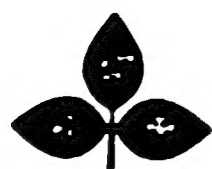
প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৭৬
দশম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

ISBN 81-7066-349-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

SUDUR JHARNAR JALE
[Novel]
by
Nillohit

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১০০.০০

মার্গারিট, তোমার জন্য

এই লেখকের অন্যান্য বই

কৈশোর
চলো দিকশূন্যপুর
জীবনের এপিঠ ওপিঠ
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী
তিনটি নীললোহিত
তোমার তুলনা তুমি
দীপ্তি উধাও রহস্য
নিয়তির মুচকি হাসি
নিরুদ্দেশের দেশে
পঞ্চশরের একটি কম
পাতাপাহাড়ীর বনদেবতা
ব্যর্থ প্রেমিকের মুখশ্রী
ভালবাসা নাও, হারিয়ে যেও না
মনে আছে? মনে থাকবে
সত্যি মিথ্যের মাঝখানে

সুদূর ঝর্নার জলে

মানিব্যাগ রাখার অভ্যেস আমার নেই কখনো। যখন যা দু'চার টাকা থাকে, বুক পকেটেই রাখি। আর প্যান্টের পকেটে রাখলে চেপ্টে যায় বলে সিগারেট-দেশলাইও ঐ বুক পকেটেই রাখতে হয়। হাওয়াই সার্টের ঐ একটাই পকেট।

চক্রধরপুর থেকে ট্রাকে চেপে যাচ্ছিলাম টেবো-হেসাডির দিকে। হেসাডির বাংলোয় ইন্দ্র আর হেমন্ত আছে। ওরা এসেছে দু'দিন আগে। এ রাস্তায় দিনে দু'বার বাস চলে, কিন্তু ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার আরাম আরও বেশী। চমৎকার রাস্তা। পাহাড়ী ঘাট, এক পাশে খাদ, আর এক পাশে জঙ্গল। বিকেলের সূর্য অতিশয় গাঢ় হয়ে একটু স্থির হয়ে আছেন, এক্ষুনি অস্ত যাবেন কিনা মনস্থির করতে পারছেন না। হু-হু করা হাওয়া যেন আকাশের গায়ে গিয়েও ঝাপ্টা মারছে। ডান পাশের অরণ্যের বড় বড় বনস্পতি মাথা নোয়াচ্ছে বারবার স্বাগতম জানাচ্ছে বৃষ্টিকে। দূরের উপত্যকায় বৃষ্টি নেমে গেছে, এখান থেকেই দেখা যায়।

এই সময় প্রকৃতি আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করলেন।

ট্রাক ড্রাইভারটি বেশ আমুদে। সেকেন্ড গীয়ারে গতি রেখে গান গেয়ে যাচ্ছে অনবরত, দুর্বোধ্য ছেকাছেনি ভাষায় গান, যার একবর্ণ আমি বুঝি না। মাঝে মাঝে আমাকে চমকে দেবার জন্য এই বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় সে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নেয়। একটু আগে খাদের মধ্যে একটা ওল্টানো বাস দেখে এসেছি। তবু তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমি বললাম—আউর জোরে চালাইয়ে। এ কেয়া বয়েল গাড়ি চলতা হ্যায়।

রোগা মতন ক্লিনারটি আমার আর ড্রাইভারের মাঝখানে বসেছে। সে কথা বলে না, শুধু গানের তাল দেয়। ট্রাক ভর্তি সিমেন্টের বস্তা। ক্লিনারটির হাতে এবং জামায় এখনো সিমেন্টের গুঁড়ো লেগে আছে। লোকটার রং যা কালো, মুখেও কিছু সিমেন্ট মেখে নিলে পারতো। তারপর বৃষ্টিতে ভিজলেই একেবারে পাকা রং।

একবার সে বললো, 'বাবু, ম্যাচিসঠো দিজিয়ে তো!'

তখন আমারও সিগারেট টানার ইচ্ছে হলো। হাওয়ায় বেশ শীত শীত ভাব পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করতে যেতেই ফরফর শব্দে টাকাগুলোও বেরিয়ে এলো। এবং আমি খপ করে ধরবার আগেই প্রবল হাওয়ায় সেগুলো চলে গেল গাড়ির বাইরে।

রোক্‌কে রোক্‌কে বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলেও সঙ্গীতপ্রেমিক ড্রাইভারের

ব্যাপারটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগলো। তা ছাড়া সেটা বাঁকের মুখ। গাড়ি থামলো, একটু দূরে।

ছুটে এসে দেখলাম, হাওয়ায় চড়ুই পাখির মতন আমার নোটগুলো উড়ছে। কিংবা কার্পাসের বীজের মতন। দৌড়োদৌড়ি করে সেগুলো ধরার চেষ্টা করলুম, কোনোটাই ধরা যায় না। টাকা জিনিসটা যে মানুষের হাত ছাড়িয়ে সব সময়েই পালাতে চায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে নোটটাকে আমি প্রায় ছুঁই ছুঁই, সেটাই টুপ করে পালিয়ে যায় খাদের দিকে। দু' একটা উড়ে গেল আকাশের দিকে। আমার রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পাওয়া টাকাগুলো ছন্নছাড়ার মতন চলে গেল এদিক সেদিক। এত হাওয়া যে আমার চোখের ওপর নিজের চুলের ঝাপ্টা লাগছে, ভালো করে দেখতেই পাচ্ছি না।

কোনোক্রমে দেখলাম, একটা দশ টাকার নোট খাদের সামান্য নিচে একটা বনতুলসী গাছের ওপর চুপ করে বসেছে। দু' তিনটে পাথরে পা দিয়ে নেমে গেলে ওটাকে উদ্ধার করা যায়। একটা পাথরে পা দিয়ে নেমেছি, পেছন দিক থেকে ড্রাইভারটি আমার এক হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধমকে উঠলো। সংগে সংগে আর এক হাওয়ার ঝাপটায় নোটটা গাছের শুকনো পাতার মতন আবার উড়ে গেল, আমারই চোখের সামনে সেটা দুলতে দুলতে নেমে গেল অনেক নিচে। বৃষ্টিতে ভিজে যদি একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় তা হলে হয়তো কোনোদিন কোনো রাখাল বালক ওটা কুড়িয়ে পাবে।

ক্লিনারটি হা-হা করে হাসছে। ড্রাইভারটি বললো, 'দশ রুপিয়ার জন্য জান দিতে যাচ্ছিলেন?'

বাতাসে আমার একটা বড় নিশ্বাস মিশিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই আকস্মিক ঘটনায় ড্রাইভার ক্লিনার দু'জনেই বেশ মজা পেয়েছে। ওদের আর দোষ কি? অন্য কারুর টাকা উড়ে গেলে আমিও হাসতাম।

—কিংনা রুপিয়া থা?

বেশী নয়, মাত্র বত্রিশ টাকা। একথা শুনেও ওরা হাসি থামালো না। যাক, এই বত্রিশ টাকার বিনিময়ে একটা মজার খেলা দেখা গেল। ঠিক বত্রিশ নয়, ঊনত্রিশ টাকা, কারণ ড্রাইভার আর ক্লিনার দু'জনে মিলে তিনটে এক টাকার নোট উদ্ধার করতে পেরেছে, আমি একটাও পারিনি।

টাকাটা সত্যিই বেশী না। কিন্তু সেটাই যে আমার যথাসর্বস্ব, সেটা তো ওরা জানে না! বলাও যায় না। আমি এসেছি ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর ভরসায়, ওদের এখন রোজগার আছে, আমি বেকার।

আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। বুকের ভেতরটা ফাঁক ফাঁকা লাগছে। সিগারেটে স্বাদ নেই। আমার তুলনায় এই ট্রাক ড্রাইভারও অনেক বড়লোক। ও ঊনত্রিশ টাকা নিয়ে এখনো হাসি ঠাট্টা করছে। কিংবা, ও নিশ্চয়ই ভাবছে আমার প্যান্টের

পকেটে সুদৃশ্য কোনো চামড়ার ব্যাগে থরে থরে একশো টাকার নোট সাজানো আছে, বাবুদের যে-রকম থাকে।

সন্ধের কাছাকাছি হেসাডি ডাক-বাংলোর মুখটায় ওরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। কোনো রকম দীনতা প্রকাশ না করে আমি ড্রাইভারের হাতে পূর্ব প্রতিশ্রুত দু' টাকা দিয়ে দিলাম। এবং বিদায় সম্ভাষণের পর দু'জনকে আমার প্যাকেট থেকে দুটি সিগারেট উপহার।

পকেটে একটি মাত্র টাকা নিয়ে আমি বাংলোর গেট খুলে ভেতরে এলাম বারান্দায় আলো জ্বলছে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তকে খুব রোমহর্ষক ভাবে বলতে হবে ঘটনাটা।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস তখনো শেষ হয়নি। বাংলোতে দুটি ঘর। দুটি ঘরেই দু'জন সরকারি অফিসার সপরিবারে উপস্থিত। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর পাত্তা নেই। এ বাংলোতে আগেও দু'বার এসেছি, কোনোবারই রিজার্ভ করে আসিনি, প্রত্যেকবারেই ফাঁকা পেয়েছি।

বাংলোর সামনে একটা বড় মাঠ। তার ওপাশে চৌকিদারের ঘর এবং রান্নাঘর। মাঠ পেরিয়ে এসে ডাকলাম, 'লেমসা, লেমসা!'

চৌকিদারটি আগের দু'বারই আমাদের খুব খাতির করেছিল। ওর নাম আসলে নেলসন, ওরাও খৃষ্টান, কিন্তু নিজেই নাম বলে, লেমসা।

সে বেরিয়ে এসেই বললো, 'ঘর খালি নেই!'

আমি বললাম, 'কি রে, চিনতে পারছিস না?'

সে এমন একটা ভাব করলো, যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়। এর স্মৃতিশক্তি এত খারাপ কেন?

তখনই আমার মনে পড়লো, এর আগে এসে প্রথমেই লেমসাকে বকশিশ দিয়েছি কিছু। কাজের আগে টাকা না দিলে ওর উৎসাহ আসে না। এমনি ছেলেটি বড় ভালো, কিন্তু আগে ওকে সন্তুষ্ট না করলে এক পাও হাঁটতে চায় না। কিন্তু আমার কাছে আছে একটি মাত্র টাকা ও কিছু খুচরো। পকেট একেবারে শূন্য করলে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার দুই বন্ধু এখানে এসেছিল, তারা কোথায়?'

সে জানালো যে দু'দিন আগে দুই বাবু এসেছিল ঠিকই, তারা এখানে জায়গা না পেয়ে বদগাঁও চলে গেছে। আমাকেও সেখানে যেতে বলেছে।

সে তো কালকের কথা। সন্ধের পর এখানে বাস চলে না, অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাক যেতেও ভয় পায়। আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে, এবং খেতেও হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, পকেটে টাকা না থাকলেই আমার খিদে আরও বেড়ে যায়।

হাতে ঘড়ি নেই, সঙ্গে কলম কিংবা একটা এমন দামী জিনিসও নেই, যা জমা রাখতে পারি। আছে শুধু একটা সস্তা ডট্ পেন, যার কোনো মূল্যই নেই লেমসার কাছে। আর দু জোড়া প্যাণ্ট সার্ট, দুটো পাজামা, দুটি গেঞ্জি। এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে আর কি!

লেমসা তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, তার পেছনে পেছনে গিয়ে খুব মোলায়েম গলায় বললাম, 'লেমসা, আমাকে রাতটা যে এখানেই থাকতে হবে?'

লেমসা স্বভাবগম্ভীর। টাকা না পেলে আরও গম্ভীর হয়ে যায়। বললো, 'জায়গা নেহি!'

উনুনের পাশে বসে আছে লেমসার স্ত্রী ফুলমণি। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী রমণী। সুতরাং আমি লেমসার ঘরেও থাকতে চাইতে পারি না।

—একটা খাটিয়া যদি পেতে দাও বারান্দায়!

—খাটিয়া নেহি।

—তাহলে গ্যারাজ ঘরটা খালি আছে না?

—ও ঘরে এক বাবু আছে!

এই প্রায়-কেউ-নাম-জানে-না বাংলোয় হঠাৎ এত লোক সমাগম কেন গ্যারাজটা পর্যন্ত ভর্তি! অল্প অল্প শীত আছে, একেবারে মাঠে শুয়ে থাকা যাবে না। তা ছাড়া, যে-কোনো সময়ে বৃষ্টি আসবে।

ঝোলা থেকে আমার শ্রেষ্ঠ জামাটা বার করলাম। র-সিল্কের। লেমসাকে বললাম, 'তোর জন্য এই জামাটা এনেছি, দ্যাখ তো গায়ে লাগে কিনা।'

পাহাড়ী লোকেরা জামা-কাপড় সম্পর্কে বেশ খুঁতখুঁতে। ডাক-বাংলোর চৌকিদার হলেও লেমসা তার খৃষ্টান-গর্ব ঠিক রেখেছে, সে প্যাণ্ট ছাড়া ধুতি পরে না, এবং কোমরে চওড়া বেল্ট। জামাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। তারপর পরে ফেললো। চমৎকার ফিট করে গেছে, ঠিক যেন আমার যমজ ভাই।

এবার তাকে সস্নেহ ভর্ৎসনার সঙ্গে বললাম, 'কী রে বোকা! চিনতে পারছিস না আমাকে? সেই যে দু'বছর আগে এসেছিলাম আমরা চারজন. একটা বাবু খুব ভালো নাচতে জানতো?'

লেমসা বললো, 'হুঁ!'

কে জানে তাও ওর মনে পড়েছে কিনা! যাই হোক, কাল সকাল পর্যন্ত তো ওকে খাতির করে চলতেই হবে। বললাম, 'আজ রাতটা এখানেই থাকবো আর খাবো। তোকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে, বুঝলি?'

লেমসা ঘরের মধ্যে চলে গেল। ফুলমণি একমনে উনুনে পাখার হাওয়া করে যাচ্ছে, এই সময় গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। আর টেকা যায় না এখানে।

গ্যারাজটা দেখতে গেলাম। একজন পাকানো-চেহারার লোক খাটিয়ার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বিড়ি টানছে আর অনবরত কাশছে। লোকটি বাঙালী।

লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কাশির দমকে লোকটির অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না অবশ্য। লোকটি বললো, 'আরে মশাই, কাল ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে ছিলাম কিনা সারারাত, ওঃ, যা ঠাণ্ডা বসে গেছে!'

—কেন, সারারাত বাইরে ছিলেন কেন?

—কোথাও জায়গা পাই না। এদিকে সব সার্ভের লোক এসেছে কিনা, বাংলোগুলো ভর্তি। তাই গাড়িতে শুয়ে রইলাম।

—গাড়ি?

বাংলোতে তো কোনো গাড়ি দেখিনি এখন পর্যন্ত। এমন কি যে সরকারি অফিসাররা রয়েছে, তাদেরও গাড়ি নেই।

লোকটি বললো, 'আমার গাড়ি দেখেননি? গেটের বাইরে রয়েছে, ও গাড়ি কি কারুর চোখে না পড়ে পারে। পাঁচ টন ওজন—হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।'

লোকটা দম ফুলিয়ে হাসতে লাগলো। একটু পরে পরিষ্কার হলো রহস্য। গাড়ি মানে রোড রোলার। পিচ-রাস্তা সারাবার সময় যেগুলো দেখা যায়। লোকটি সেইরকম একটি রোড রোলার রাঁচী থেকে চক্রধরপুরে ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ী রাস্তায় সারা দিনে আট দশ মাইলের বেশী চলে না।

এত কাশি সত্ত্বেও লোকটির বিড়ি খাওয়ার শখ খুব। একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে যাচ্ছে। আমি সিগারেটের প্যাকেট বার করতেই হ্যাংলার মতন তাকালো। প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'নেবেন একটা?'

—দিচ্ছেন? তাহলে দুটো নিই? কাল সকালে ইয়ে করার সময় একটা পেলে বেশ যুৎসই হয়।

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে এই ভাঙা প্যাকেটটা আপনার কাছেই রাখুন!'

ঝোলার মধ্যে আরও তিন প্যাকেট সিগারেট আছে। ও ব্যাপারে আপাতত নিশ্চিন্ত। তাছাড়া লোকটিকে খুশী রাখা দরকার। রাত্রে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখানেই ওর সঙ্গে শুতে হবে।

আবার লেমসার ঘরের বারান্দায় চলে এলাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। উনুনের আঁচটা গায়ে বেশ আরাম দেয়। এক কাপ চা পেলে বেশ হতো।

লেমসা আর বউ চা-ই বানাচ্ছে তখন। দেয়ালের কাছে বসে পড়ে আপনজনের মতন বললাম, 'দে রে লেমসা, আমাকে এক কাপ চা দে।'

লেমসা মুখ তুলে বললো, 'এ চা-চিনি-টিনা-দুধ বাবুলোককো হ্যায়!'

মনে পড়লো লেমসার কাছে কিছুই থাকে না, সবই পয়সা দিয়ে কিনে আনাতে হয়। কাছেপিঠে কোনো দোকান নেই। সিগারেট কিনতে গেলেও

সাত মাইল দূরে বদগাঁওর হাটে যেতে হবে। তবে কাছাকাছি গ্রামের মধ্যে চাল আর মুর্গী পাওয়া যায়।

বললাম, 'ওর থেকেই একটু দে না বাবা! বাবুরা কি আর দেখছে!'

লেমসা কোনো উত্তর দিল না। মান খুইয়ে চাইলাম, যদি এর পরও না দেয়! স্বামী-স্ত্রী কি যেন বলাবলি করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। তারপর আমার মান রাখল ফুলমণি। সে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি তাকালাম তার দিকে। যদিও সে কোনো বিখ্যাত শিল্পীর কালো পাথরের ভাস্কর্যের মতন রূপসী, তবু তখন তার সম্পর্কে আমার মনোভাব, নারীজাতি সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন অনেকটা।

চায়ের ব্যাপারেই লেমসার ব্যবহারে খটকা লেগে গেল। ব্যাটা রাত্তিরে খেতে-টেতে দেবে তো? বাতাস থেমেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মাত্র সাতটা বাজে, সামনে একটা লম্বা রাত। চতুর্দিক এত নিস্তব্ধ যে নিস্তব্ধতারও যেন একটা শব্দ শুনতে পাই।

তিনটে মুর্গী ছাড়িয়ে রাখা আছে শালপাতার ওপর। ফুলমণি মশলা বাটছে। বাংলোর সাহেবদের জন্য লেমসা এখন ওমলেট ভাজছে, তার থেকে নিশ্চয়ই আমায় দেবে না। দেখতে দেখতেই আমার খুব জোরে ক্ষিধে পায়। যেন পেটের মধ্যে একটা রেলের হুইস্‌ল!

—রাত্রে কী খেতে দিবি লেমসা?

—চাউল লানে হোগা, রুপিয়া দিজিয়ে।

লোকটা তো সাঙ্ঘাতিক চশমখোর! একটু আগে একটা অত দামী জামা দিলাম, তার জন্য একটুও কৃতজ্ঞতা নেই! এরা জিনিসপত্র তত গ্রাহ্য করে না, টাকাটাই আসল। আগেরবার এসে দেখেছি, প্রত্যেক রাত্রে লেমসা প্রচুর মহুয়া খেয়ে হৈ-হল্লা করে। আজ বোধহয় এখনো মহুয়া কেনার টাকা জোটেনি। সরকারি অফিসারদের কাছে তো সহজে বকশিশ পাওয়ার উপায় নেই।

আমার একটা টাকা ওকে দিয়ে কিছু লাভ হবে না। ডাক-বাংলোর কোনো বাবু এসে চৌকিদারের হাতে কক্ষনো মাত্র এক টাকা দেয় না। গ্রামের মধ্যে যদি চাল কিনতে যায়—তাহলে সেজন্য ওর পারিশ্রমিকই হবে অন্তত দু' টাকা।

—লেমসা, এদিকে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

উনুন ছেড়ে লেমসা সহজে আসতে চায় না। দুখানা ওমলেট ভাজবার পর সেগুলো আর চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে সাজিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেই লেমসা বাবুদের দিয়ে এলো। তারপর তাকে আমি বারান্দার এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'শোন্ লেমসা, আমার ব্যাগ হারিয়ে গেছে, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। বদগাঁওতে আমার বন্ধুরা আছে, কাল সকালেই তুই সব টাকা পেয়ে যাবি। ঠিক আছে তো? কোনো চিন্তা নেই।'

কিন্তু লেমসার কাছে বোধহয় আজ রাত্রের মহুয়া কেনার টাকা জোগাড় করাই সবচেয়ে জরুরি। সে কোনো সাড়া শব্দ করলো না। আবার নিজের কাজে ফিরে গেল। তারপর আমারও আর কিছু করার নেই, শুধু বসে বসে ওদের রান্নাবাড়ি দেখা। শুধু শুধু ঊনত্রিশটা টাকা গেল! সে টাকাটা থাকলে আজ একটা রাত অন্তত লেমসার কাছে কত ফাঁটের সঙ্গে থাকা যেত। কত কষ্টের টাকা! যে বাড়িতে টউশানি করি, তারা সাত তারিখের আগে মাইনে দেয় না বলেই তো ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর সঙ্গে আমার আসা হলো না। ওরা পাঁচ তারিখে ট্রেনের টিকিট কেটেছিল। সেই পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর ছোটকাকার কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার। কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে আর ট্রেনের টিকিটে বাকি টাকাটা গেছে। ভেবেছিলাম এক টিন চীজ্ কিনে আনবো, শেষ পর্যন্ত কিপ্টেমী করে কিনিনি। ইস কেন যে কিনিনি! চীজের টিন তো আর টাকার মতন উড়ে যেতে পারতো না! আমার মতন এরকম কেউ কখনো সত্যিকারের টাকা উড়িয়েছে?

—থোড়া গরম পানি দাও না। হরলিকস্ বানায়গা!

দুটি মেয়ে বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে দৌড়ে উঠে এলো বাংলোর বারান্দায়: একজনের হাতে একটা ফ্লাস্ক। আর একজন লেমসাকে ধমক দিয়ে বললো, 'এতক্ষণ ধরে ডাকতা হায়, শুনতা নেই?'

আমি আড়ষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম। দুজনের মধ্যে একজন বেশ সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েরা কাছাকাছি এলে আমি চোখভরে না দেখে পারি না। এখন মনে হলো, ওরা যেন আমার মুখটাও দেখতে না পায়। বুকের মধ্যে চড়চড় করছে। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলে নিজেকে মানুষ বলেই মনে হয় না।

গরম জল চেপেছে। বৃষ্টিও জোরে এসেছে। মেয়ে দুটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কল্ কল্ করে কথা বলতে লাগলো। অন্য যে-কোনোদিন হলে, এদের সঙ্গে আমার ভাব করা ছিল নদীতে স্নান করার মতনই সহজ। কিছুটা সময় অন্তত সুন্দরভাবে কাটতে পারতো। আমি ঘুমের ভান করে মুখ গুঁজে রইলাম।

মেয়ে দুটি বোধহয় ইঙ্গিতে একবার ফুলমণিকে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি কে? ফুলমণি ভাঙা ভাঙা ভাষায় যা উত্তর দিল, তাতে কিছুই বোঝা গেল না। মেয়ে দুটি নিশ্চিত আমাকে সন্দেহ করছে, ভয়ও পেতে পারে। প্যান্ট-সার্ট পরা ভদ্রলোকের মতন চেহারার একজন যুবক চৌকিদারের ঘরের বারান্দায় বসে ঝিমোয় কেন? মেয়ে দুটি তাদের বাবার কাছে নালিশ করে আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। সুন্দরী মেয়েরাও কত নিষ্ঠুর হয় তা জানি! ডাক-বাংলোতে যারা জায়গা

পায় আর যারা জায়গা পায় না, তাদের মধ্যে একটা প্রকৃত হ্যাভ আর হ্যাভ নট্‌স-এর মতন শ্রেণীবৈষম্য গড়ে ওঠে। তাও আমার বুক পকেটে পয়সা থাকলে আমার বুকের জোর বাড়তো, যে-কোনো লোকের সঙ্গে ধমকে কথা বলতে পারতাম।

একটু বাদে লেমসা বাংলো থেকে ছাতা নিয়ে এলো। সেই এক ছাতা মাথায় দিয়ে মেয়ে দুটি নেমে পড়লো বারান্দা থেকে। হাওয়ার তোড় এখনো কমেনি। ছাতা উড়ে যেতে চায়, মেয়ে দুটি আউ! উঃ! এই, এই, এই! হি-হি-হি শব্দ করছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, যাক না ছাতাটা উড়ে! কিংবা ছাতাটা উল্টে গিয়ে শিক-ফিক ভেঙে যাক্। মেয়ে দুটো মাঠের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লে আরও ভালো হয়! আমার মধ্যে একটা প্রতিশোধ কিংবা হিংসের আগুন জ্বলে উঠছিল। গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডে যে-সব ভিখিরিরা বসে থাকে, তাদের মনেও নিশ্চয়ই এইরকম চিন্তা জাগে।

বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাবার উপায় নেই, শুধু চুপচাপ বসে থাকা। হাতকাটা সোয়েটার শীত মানে না। সঙ্গে কম্বল-টম্বলও নেই। ডাক-বাংলোয় আসবার সময় কে আবার বিছানা আনে? উনুনের আঁচে ফুলমণির লালচে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি যেন তার শরীর থেকে উষ্ণতার ভাগ নিচ্ছি, দশ ফুট দূরে বসে থেকে তাকে না ছুঁয়ে।

রান্না চলতে লাগলো, নানারকম গন্ধ। দু' একটা রাত না-খেয়ে থাকা এমন কিছু নয়, এরকম আমি আগেও থেকেছি। কিন্তু রান্নার উনুনের পাশে এরকম বসে থাকা যে কী কষ্টকর! লোভী শিশুর মতন আমি খিদের জ্বালায় ছটফট করছি। ছেলেবেলায় জ্বর হবার পর যেমন রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতাম। খালি মনে হচ্ছে, লেমসা কখন খেতে দেবে! কখন খেতে দেবে!

উনুনের ওপর মুর্গীর মাংসতে শেষবার ঘি ঢালবার পর লেমসা ভাত বাড়তে শুরু করলো। এতক্ষণ ওর সঙ্গে আমি একটি কথাও বলিনি, অন্যমনস্ক থাকবার জন্য সিগারেট ধ্বংস করছিলাম শুধু। পা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, এবার পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসলাম, ভাতের থালার জায়গা করার জন্য সামনে থেকে সরিয়ে রাখলাম ঝোলাটা।

কিন্তু কয়েক প্লেট ভাত বেড়ে লেমসা নিয়ে গেল ডাক-বাংলোয়। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। ফিরে এসে আবার ডাল আর আলুভাজা নিয়ে গেল। তারপর মাংস। আমি মাথা হেঁট করে মাটিতে দাগ কাটছি। মুনি-ঋষিরা কীভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতেন? আমি পারবো না কেন? ধরা যাক, এই মুহূর্তে খবর পেলাম আমার বাবা মারা গেছেন, তাহলে কী আর আমার খাওয়ার ইচ্ছে হতো?

খানিকটা বাদে লেমসা একটা কাচের প্লেটে খানিকটা ভাত এনে দিল আমার সামনে। ছোট প্লেটে একটু ডাল। আমি তবু হাত গুটিয়ে বসে রইলাম চুপ করে। হাজার হোক, আমি বাবুদের বাড়ির ছেলে, শুধু ডাল আর ভাত তো খেতে পারি না। আর কিছু দিক, তারপর দেখা যাবে।

কিছুই দিল না আর। এবার রাগ হয়ে গেল। আমি কি বিনা পয়সায় খাচ্ছি? কাল সকালেই সব কিছুর দাম বকশিশ সমেত চুকিয়ে দেবো। গম্ভীর গলায় বললাম, 'লেমসা, আর কিছু নেই?'

লেমসা বললো, 'ভাজি খতম হো গিয়া। মুর্গা তো বাবুলোককা হ্যায়।'

অর্থাৎ আমি আর বাবু নই। যার পয়সা থাকে না, সে আবার বাবু কি! কে বলে যে ব্যবসায়ীরাই শুধু পয়সা চেনে? গরীবরা আরও বেশী চেনে।

এ তো মা নয় যে, রাগ করে ভাতের থালা ঠেলে ফেলে উঠে যাবো? তবু সেইরকমই অভিমান হয়। ঢোঁক গিলে বললাম, 'ঠিক হ্যায়, একঠো পেঁয়াজ আর হারা মির্চে দেও!'

তখন ফুলমণি বললো, 'একটু ঝোল লিবেন?'

পোর্সিলিনের পাত্রে মুর্গীর খানিকটা তলানি ঝোল আর কুচো দু' এক টুকরো মাংস পড়ে আছে। ফুলমণি সেটা নিয়ে এলো কাছে। আমি না-না বলে হাত দিয়ে থালা চাপা দিলাম। ফুলমণি তবু শুনলো না, একহাতা কুচো মাংস আর ঝোল ঢেলে দিল আমার প্লেটে। ওর দিকে রক্তচক্ষে তাকালাম। তারপর সেই ঝোল ও মাংস সমেত সেই জায়গার ভাত তুলে ফেলে দিলাম মাটিতে। বাকি ভাতটা ডাল আর পেঁয়াজ-লংকা দিয়েই খেয়ে শেষ করলাম।

মাত্র সাত মাইল দূরের ডাক-বাংলোতে ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত এখন কতরকম কী খাচ্ছে কে জানে। ওরা দুজনেই দিলদরিয়া। ইন্দ্রনাথ আবার দারুণ খাদ্যরসিক, অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টের কার্টাসিনস্কির মতন যে-কোনো দুর্গম জায়গাতেও ও দারুণ সুখাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই এখন ভাবছে আমার কথা, তাই একবার বিষম খেলাম।

খেয়ে উঠে হাত ধুতে গিয়ে দেখি বালতিতে জল নেই। জিজ্ঞেস করলাম 'লেমসা, পানি?'

লেমসা বললো, 'বালটিমে নেই হ্যায়? কুঁয়াসে লে লিজিয়ে।'

অর্থাৎ কুয়ো থেকে আমাকেই জল তুলতে হবে। এরপর পাছে ও আমাকে বাসন মেজে দেবার জন্য হুকুম করে, তাই নিজেই আমি এঁটো প্লেটটা তুলে নিলাম। দুঃখ হতে লাগলো জামাটার জন্য। বড্ড প্রিয় জামা ছিল আমার। ব্যাটাকে বগলের কাছে ছেঁড়া তাঁতের শার্টটা দিলেই তো হতো। যাক্, একটা রাত তো। কেউ তো আর দেখছে না আমার এই অপমানের দৃশ্য।

রোড-রোলার চালক সঙ্গে পাঁউরুটি আর শুকনো খেজুর রাখেন, তাই

খেয়েই শুয়ে পড়েছেন। বাকি রাতটা সেই কেশো রুগীর পাশে শুয়েই কাটলো।

ঘুম ভাঙলো খুব ভোরেই। ডাক-বাংলোর অধিবাসীরা জাগবার আগেই আমি কুয়োর কাছে গিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে নিলাম। কতক্ষণে হেমন্ত আর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে! এখানে আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই। লেমসা নিশ্চয়ই সকালের চা দেবে না।

প্রথম বাস আসে প্রায় দশটার সময়। সকালের দিকে বেশী ট্রাকও চলে না। লেমসার সাইকেলটা নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তারপর লেমসা বাসে করে গিয়ে সাইকেলটা ফেরত নিয়ে আসবে। বিশ্বাস করে দেবে তো?

এই সময় লেমসা নিজেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

লেমসা জানালো, ওকে বদগাঁওতে যেতে হবে আন্ডা আর মাখন আনবার জন্য।

দমে গেলাম। পাহাড়ী চড়াই রাস্তা, এক সাইকেলে দুজন যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি চাইলেও ও নিশ্চয়ই রাজী হবে না। এখন ট্রাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গতি কি?

লেমসা আজ আমারই সার্টটা পরেছে। যদিও মুখে একটুও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নেই, তবু ওকে অনুরোধ করলাম, 'তুই একটা কাজ করবি লেমসা? বদগাঁও ডাক-বাংলোতে যে দু'বাবু আছে, তাদের খবর দিয়ে আসবি? বলবি যে আমি একটু পরেই আসছি। আচ্ছা, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তোকে ওরা পাঁচ টাকা বকশিশ দেবে।'

চিঠি নিয়ে লেমসা চলে গেল। আমি বাংলোর কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কালভার্টের ওপর বসে রইলাম ট্রাকের প্রতীক্ষায়। মাত্র সাত মাইল রাস্তা, এক টাকায় নিয়ে যেতে যে-কোনো ট্রাক রাজী হবে।

একটু বাদে দুজন বয়স্ক লোক, দুই মহিলা, পাঁচটা বাচ্চা আর কাল সন্ধেবেলা দেখা সেই দুই যুবতী এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। এঁরা মর্ণিং ওয়াকে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে একটা বই বার করে অখন্ড মনোযোগে পড়তে শুরু করি। এঁদের সঙ্গে একটাও কথা বলতে চাই না। যে-কোনো কারণেই হোক, এরা আমার শত্রু হয়ে গেছে।

ট্রাক এলো না, কিন্তু দেড় ঘন্টার মধ্যে ফিরে এলো লেমসা। সঙ্গে একটা চিঠি। ইন্দ্রনাথ লিখেছে, 'হঠাৎ এদিকে সার্ভে-ডিপার্টমেন্টের অনেক লোকজন এসে গেছে, কোনো ডাক-বাংলোতে জায়গা নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেও থাকার জায়গা পেলাম না। আমরা রাঁচীর দিকে চলে যাচ্ছি। নেতারহাটে থাকবো। তুই চলে আয়। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করবো। বাংলোর চৌকিদারের কাছে চিঠি রেখে যাচ্ছি।'

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কথা ছিল। তার বদলে হাসি পেল। ওদের তো দোষ নেই, ওরা জানবে কি করে যে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছি। ওদের রোজগার আছে, আমার নেই, তবু নিজের গাড়ি-ভাড়াটা অন্তত আমি সব সময়েই জোগাড় করে আনি।

এখন আমার কাছে দু' দিকের পথই সমান। রাঁচী যাবারও ভাড়া নেই কলকাতা ফেরারও ভাড়া নেই। তাছাড়া আছে লেমসার বকশিশের দায়। পকেটের একটা টাকা এখন আর কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়। লেমস চিঠিটার মর্ম জানে না। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'শোন্, বাবুরা চক্রধরপুর আছে। আমরা দু'দিন পরে আবার আসছি, তোকে ভালো করে বকশিশ দিয়ে দেবো তখন। কি রে, ঠিক আছে তো?'

লেমসা উল্টো দিকে হাত দেখিয়ে বললো, 'চক্রধরপুর নেহি, বাবুলোক ইধার গিয়া।'

এই রে, ধরে ফেলেছে দেখছি। তবু জোর দিয়ে বললাম, 'না না, চক্রধর-পুরেই গেছে। আমরা আবার ফিরে আসছি, তোর কোনো চিন্তা নেই।'

লেমসা মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আর কথা না বাড়িয়ে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলুম।

খানিকটা পরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। এবার কোন্ দিকে যাবো? মন টানছে বন্ধুদের দিকে। ওরা দুজনে মিলে আনন্দ করছে, আর আমি এখানে পরিত্যক্ত, একা! নিজের দোষেই আমার এই অবস্থা, তবু মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভিমান জন্মায়। মনে হয়, পৃথিবীর কেউ আমাকে চায় না। বন্ধুরাও আমাকে ভুলে গেছে। আমার জন্য কেউ কোথাও অপেক্ষা করে নেই।

রাঁচীর দিকে যাবার কোনো মানে হয় না। নেতারহাট ভিড়ের জায়গা। টিপিক্যাল টুরিস্ট স্পট। ওসব আমার ভালো লাগে না। কথা ছিল, এদিক থেকে আমরা সারাণ্ড্রা ফরেস্টের দিকে যাবো, কারো নদীর উৎস সন্ধান করে আসবো। তাছাড়া, ভিক্ষে করেই যখন যেতে হবে আমাকে তখন কলকাতার দিকে ফেরাব চেষ্টা করাই ভালো। এবার যে-কোনো উপায়েই হোক একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে, আমিও হেমন্ত বা ইন্দ্রনাথের মতন প্যান্ট-সার্টের বিভিন্ন পকেটে গোছা গোছা টাকা রাখবো।

আসবার সময় পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল, ফেরার পথটা ঢালু। হাঁটা খুব কষ্টকর নয়। যদিও পুরো রাস্তাটা হেঁটে ফেরা একটা অবাস্তব প্রস্তাব, তবু কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বাস বা ট্রাকের ভাড়া কমানো যায়। তাছাড়া আর একটা কথা ধারবার আমার মাথায় ঘুরঘুর করতে লাগলো। আজ সকালে বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। যে-জায়গায় আমার নোটগুলো উড়ে গিয়েছিল, সেখানটায় গিয়ে আর একবার খুঁজলে হয় না! প্রকৃতি তো এখন আমার ওপর প্রসন্নও হতে

পারেন। যদি অন্তত একটা দশ টাকার নোটও পাওয়া যায়।

খানিকটা এগোবার পর রাস্তার পাশে একটা বাড়ি চোখে পড়লো। বাড়িটা আমার চেনা। সাদা রঙের এই দোতলা বাড়িটা একজন ঠিকাদারবাবুর। গতবার আলাপ হয়েছিল। বেশ ছটফটে ধরনের দিলদরিয়া লোক, সেবার ওর জিপে করে আমাদের জঙ্গলের অনেক গভীরে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। ঐ ঠিকাদার-বাবুর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে কিছু টাকা ধার চাইলে কেমন হয়! লোকটার তো অনেক টাকা। কলকাতায় গিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেই হবে।

খানিকটা এগিয়েও থেমে গেলাম। যদি না দেয়! যদি অবিশ্বাস করে? সেই বাড়তি অপমানটুকু নিতে যাবো কেন? তাছাড়া সেবারই সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা মেয়েমানুষ চালান দিয়েও পয়সা রোজগার করে। খেতে না-পাওয়া সাঁওতাল-ওরাওঁ মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুর্গাপুর বা আসামে চালান করে দেয়। সেবার আমি একটি আদিবাসী মেয়ের রূপের প্রশংসা করায় লোকটা বলেছিল, 'চান? এর মধ্যে কোন্‌টাকে চান বলুন, সবাই তো আমার হাতের মুঠোয়।' কুৎসিত লেগেছিল শুনে।

কোথায় যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম: যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। যে অধম, তার কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে পাওয়ার চেয়েও, আমার চেয়ে যে গুণে বড়, তার কাছ থেকে কিছু চেয়ে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভালো। আর গেলাম না।

রাস্তার দিকে তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে চেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যদি একটা টুকরো কাগজও চোখে পড়ে অমনি উল্টেপাল্টে দেখি। মাঝে মাঝে উল্টো দিক থেকে ট্রাক আসছে, তখন ধার ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছি। আবহাওয়া খুব সুন্দর বলে হাঁটায় কোনো কষ্ট নেই সত্যিই।

কোন্ জায়গায় আমার টাকা হারিয়েছে, তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পাহাড়ের অনেক বাঁকই এরকম। তবু এক সময় ঠিক চিনতে পারলাম। এই তো খাদের পাশে সেই বনতুলসী গাছটা, যার ওপর অন্যরকম ফুলের মতন আমার দশ টাকার নোটটা ফুটেছিল!

তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম জায়গাটা। টাকাগুলোর চিহ্ন নেই। তবু কেন যে আমাকে আরও কষ্ট দেবার জন্য এখানেই পাঁউরুটির খোলসের কয়েকটা টুকরো পড়ে থাকবে! সেগুলো বারবার কুড়িয়ে আমাকে আহম্মক হতে হয়। এই কাগজগুলো উড়ে যেতে পারতো না!

জায়গাটা আমাকে চুম্বকের মতন আটকে রাখলো. ছেড়ে যেতে পারলাম না। একটা পাথরের ওপর বসলাম। এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে একটুক্ষণ টানবার পর লক্ষ্য করলাম, জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। সামনে বিশাল ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। নিচের সমতলভূমি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে

বসে থাকলে মনে হয়, পৃথিবীটা কী নির্জন! মানুষের বসবাস করার পক্ষে পৃথিবীটা এখনও কত সুন্দর! চতুর্দিকে এত সবুজ, এমন শান্ত সুগম্ভীর পাহাড়, এমনি এমনিই ফুটে আছে কত বুনো ফুল। এমনকি শালের মতন কঠিন গাছও কত নরম সুন্দর ফুল ফোটায়। এখানে আকাশ বেশী নীল, এবং এই নীল রঙের মধ্যে কোনো বিষাদ নেই।

কে বলে খালিপেটে সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না? যে-জায়গাটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, সেই জায়গাটারই রূপে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। নেতারহাট মোটেই এর চেয়ে ভাল জায়গা নয়। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত আমার চেয়ে বেশী কিছু উপভোগ করছে না। চক্রধরপুরে ফেরার কোনো তাড়া অনুভব করলাম না। ইতিমধ্যে দু'দিক থেকে দুটো বাস চলে গেছে। পকেটে যা পয়সা আছে, তাতে কোনোক্রমে চক্রধরপুরে পৌঁছোনো যায়।

এমন সময় বেশ জোরে একটা ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘট্ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দে যেন পাহাড় কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার মাঝখানে এলাম। দূরে একটা জিনিস দেখে কিন্তু বেশ কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ হলো।

রোড রোলার চালিয়ে সেই কেশো রুগীবাবু আসছেন। রোড রোলারটা তো চক্রধরপুরেই যাবে। এটায় উঠে বসলে তো আমার ভাড়ার টাকাটা বেঁচে যায়। যাক না আস্তে! আমার জন্য তো কেউ কোথাও অপেক্ষা করছে না। হাত তুলে সেটা থামালাম।

রোড রোলারটা চক্রধরপুরে আমাকে পৌঁছে দিল রাত দশটায়। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ক্ষিদেয় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার জোগাড়। বিকেলে শুধু এক কাপ চা খেয়েছি। সারাদিনে ঐ আমার একমাত্র খাদ্য। সেই সময় রোড রোলার চালকবাবুকেও এক কাপ চা খাওয়াতে হয়েছিল এবং তাতে আমার খুচরো পয়সাগুলি খরচ হওয়ায় গা কড়কড় করছিল। অবশ্য এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছি ভদ্রলোককে।

আসবার পথে ভেবেছিলাম, চক্রধরপুরে অনেক বাঙালী আছে, যে-কোনো একজনের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে সব খুলে বলবো। কেউ কি সাহায্য করবে না? কলকাতায় ফেরার ভাড়াটা কেউ ধার দেবে না? কিন্তু কয়েকটা বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করেও ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না। অনেক রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক ঠক জোচ্চোরও তো গাড়ি ভাড়া নেই, টাকা হারিয়ে গেছে বলে লোককে ঠকায়। কাগজে প্রায়ই পড়ি। আমাকে যে সেরকম ভাববে না, তার নিশ্চয়তা কী? পকেট থেকে হাওয়ায় টাকা উড়ে গেছে, এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে?

এবং মনের মধ্যে রয়ে গেছে সেই অহংকার। যাচঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। কোনোদিন তো কারুর কাছে কিছু চাইনি। ভিক্ষাবৃত্তি ভারতের

সবচেয়ে প্রাচীন পেশা, আমি ভিক্ষুক হিসেবেও অযোগ্য।

রাত কাটানো যায় রেল স্টেশনে। কিন্তু কিছু না খেলে কিছুতেই ঘুম আসবে না। স্টেশনের বাইরে দেখলাম, রিক্সাওয়ালারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে ছাতু খাচ্ছে। চিরকাল শুনেছি ছাতু খুব স্বাস্থ্যকর খাদ্য, খুব সস্তাও বটে। ছাতুওয়ালার কাছ থেকে চল্লিশ পয়সার ছোলার ছাতু কিনলাম। দুটো কাঁচা লঙ্কা ফ্রি। পেতলের থালায় জল দিয়ে মেখে নিলাম অন্যদের দেখাদেখি। ক্খিদের মুখে খেয়েও ফেললাম টপাটপ করে। মাঝখানে একটু দম বন্ধ করেছিলাম, আর গোল্লাগুলো জিভে না ঠেকিয়ে একেবারে গলার মধ্যে। বেশ পেট ভরে গেল। তারপর স্টেশনের কল থেকে অনেকখানি জল খেয়ে নেবার পর মনে হলো, এত চমৎকার সস্তা খাবার থাকতে অন্য আজেবাজে স্বাস্থ্যহীন খাবারের জন্য মানুষ বেশী পয়সা খরচ করে কেন?

একটু পরেই পেটটা গুলিয়ে উঠতেই আমি রেল লাইনের পাশে বসে পড়লাম। এত বেশী বমি হলো যে মনে হলো যেন আগের দিনের ভাতসুদ্ধু উঠে আসছে। দমকে দমকে বেশ কয়েক দফায় বমি করলাম। উঠে এসে মুখ ধুতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথা ঘুরছে, শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কোনোক্রমে একটা অন্ধকার মতন জায়গা খুঁজে প্লাটফর্মের মেঝেতে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুজে পরবর্তী কর্মসূচীটা ঠিক করে নিতে হলো। যদি রাত্তিরটা বেঁচে থাকি, তাহলে কাল সকালেই বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। ধরা পড়লেও, আশা করা যায়, জেলে ওরা ছাতুর বদলে ভাতই খেতে দেয়। আর যদি ধরা না পড়ি, তাহলে খড়গপুরে মানবেন্দ্রর কাছে যেতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে আর কেউ চেনা নেই।

সকালে ঘুম ভাঙলো ট্রেনের শব্দে। একটা লোকাল ট্রেন তখনই খড়গপুর যাবে। চড়ে বসলাম। ফার্স্ট ক্লাসে। ধরা পড়তে গেলে ভালো জায়গাতেই ধরা পড়া ভালো। থার্ড ক্লাসে অসম্ভব ভিড়, এখন আমার দাঁড়িয়ে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই, বরং শোওয়ার জায়গা পেলে ভালো হয়।

ট্রেনে কেউ বিরক্ত করলো না। খড়গপুর স্টেশনের একটু আগে ট্রেনটার গতি মন্থর হতেই ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। লাইন পেরিয়ে রাস্তায় এসে মনে হলো আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে? পকেটে এখনো বারো আনা পয়সা, অনায়াসে কফি আর নোনতা বিস্কুট খাওয়া যায়। তাই খেয়ে নিলাম আগে। প্যাকেটে এখনো দুটো সিগারেট। রিক্সা ডেকে চেপে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'চলো, আই আই টি।'

আই আই টি ক্যাম্পাসে মানবেন্দ্রর কোয়ার্টার আমার চেনা। ওখানে গিয়ে অন্তত একটা দিন বিশ্রাম না নিয়ে আর কলকাতায় ফেরা নয়। সারা গায়ে

দারুণ ব্যথা। এটা নিশ্চিত রোড রোলারে চাপার ফল। প্রথম ঘোড়ায় চড়লেও গায়ে এত ব্যথা হয় না।

মানবেন্দ্রর ঘর তালাবন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করে তার চাকরকে খুঁজে বার করা গেল। এই চাকরটি নতুন, আগেরবার এসে একে দেখিনি। বাবু কোথায়?

চাকর ঠিক জানে না। বাবু খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন।

—কোথায়? কলেজে?

—তা হতেও পারে।

আমি চাকরকে হুকুম দিলাম, 'যাও দেখে এসো। বাবুকে ডেকে আনবে এক্ষুনি, বলবে কলকাতা থেকে এক বন্ধু এসেছে, খুব দরকার।'

সে ডাকতে চলে গেল। আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম, 'একটু দাঁড়াতে হবে ভাই!'

সামনের কম্পাউন্ডে পায়চারি করতে লাগলাম আমার শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে। দেয়ালের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো লজ্জাবতী লতা। একটু পা লাগলেই গুটিয়ে যায়। উবু হয়ে বসে আমি সবক'টা পাতায় হাত বুলোতে লাগলাম। ইচ্ছে হলো, ওদের সঙ্গে কথা বলি।

পাতাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল একটা বড় আকারের সবুজ ঘাস-ফড়িং—বাঙাল ভাষায় যাকে বলে কয়া। সেটা তিড়িং করে লাফ দিল। অনেক দিন বাদে এরকম একটা ঘাস-ফড়িং দেখলাম। সেটাকে ধরার জন্য আমি ক্ষেপে উঠলাম। যতবার ধরতে যাই, লাফিয়ে লাফিয়ে পালায়।

এরকমভাবে বেশ সময় কাটছিল। রিক্সাওয়ালা ডাকলো, বাবু!

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। চাকরটা আসতে অনেক দেরি করছে। মানবেন্দ্র যদি কলেজে না থাকে? যদি হঠাৎ সে কলকাতায় চলে যায়! কিংবা যদি এখানেই কোনো বন্ধু বা প্রেমিকার কাছে সারাদিনের জন্য গিয়ে থাকে? আমি রিক্সার ভাড়া দিতে পারবো না। পকেট এখন সত্যিকারের শূন্য। খাঁটি সর্বহারা বলা যেতে পারে। চাকরটা যদি আমাকে দরজা খুলে না দেয়?

এই প্রথম আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মনে হলো, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না। মুখটা কুঁচকে আমি লজ্জাবতীর গুটিয়ে যাওয়া পাতাগুলোয় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'এইভাবে আর চলে না। এবার জীবনটার একটা পরিবর্তন দরকার। সত্যি এইরকম ছন্নছাড়াভাবে আর চলে না।'

॥ ২ ॥

কলকাতায় ফিরে বিদেশী খামের একটা চিঠি পেলাম। প্রায় আট ন'খানা ঝকমকে স্ট্যাম্প আঁটা। চিঠিটা এসেছে জাপানের কিওটো শহর থেকে, লিখেছে একজন অ্যামেরিকান। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আরও চার পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে ওটাও ছিল আমার টেবিলের ওপর। সেখানে চারদিনের ধুলো জমেছে। চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি দেয়ালে হেলান দিলাম। নইলে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারতাম!

"তুমি কি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে যোগ দিতে রাজী আছো? তোমাকে এক বছরের জন্য প্রতিমাসে দু'শো ডলার হিসেবে স্কলারশীপ দেওয়া হবে। তোমার যাতায়াত ভাড়ারও আমরাই বন্দোবস্ত করবো। আয়ওয়া শহরটি খুব ছোট, তবু আশা করি তোমার অপছন্দ হবে না। সেখানকার মানুষগুলি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। তোমার সম্মতি আছে কিনা তা আমাকে অবিলম্বে জানাও!"

তিনবার চারবার চিঠিটা পড়লাম। তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। কেউ ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে? তবে চিঠিটা জাপান থেকে এসেছে ঠিকই, একটি বিখ্যাত হোটেলের নাম লেখা প্যাডের কাগজ।

নাম সই দেখে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই সেই সাহেবটা। কিছুদিন আগে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। সেই সাহেবটি নাকি একজন নামকরা কবি, যদিও আমি তার নাম আগে কক্ষনো শুনিনি। সেবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে এক দুপুরে খাঁটি বাঙালী খাদ্যের এক ভোজসভা হয়েছিল। এক বন্ধুর বন্ধুর সুবাদে সেখানে আমিও জুটে গিয়েছিলাম। সাহেবটি বসেছিল ঠিক আমার পাশেই। বাঙালী খাবার খেতে খেতে ইংরেজি কথা বলা আমার ধাতে সয় না। সাহেব-টাহেব দেখলে এমনিতেই অস্বস্তি লাগে। তবু সাহেবটি আমাকে নানা খুঁটি-নাটি কথা জিজ্ঞেস করছিল।

হঠাৎ সাহেবটি একটা পটোলভাজা তুলে নিয়ে বললো, 'এটার নাম কি?'

এই সেরেছে, পটোলের ইংরেজি আবার কি রে বাবা? কোনোদিন শুনিনি। ছেলেবেলা যে ওয়ার্ডবুক মুখস্থ করেছিলাম, তাতে কি পটোল ছিল? সাহেব আমাদেরই একটা খাবারের নাম জিজ্ঞেস করলো, আর আমি তা বলতে পারবো

না? মরীয়া হয়ে বলে দিলাম, 'দিস ইজ কল্‌ড ফ্রায়েড পাট্‌ল্‌!'

আশেপাশের কয়েকজন সে কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু আমার ধারণা, তারাও পটোলের ইংরেজি জানে না। না হলে বলে দিল না কেন?

তারপরে সেই সাহেবটির সঙ্গে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। বুড়ো হলেও বেশ প্রাণশক্তি আছে। খুব লম্বা, মাঝে মাঝেই হাসতে হাসতে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। ওর নাম পল্‌ ওয়েগনার। আমরা মিঃ ওয়েগনার বলছিলাম প্রথম দিকে, সে-ই বললো, শুধু পল্‌ বলে ডাকতে। ওদের দেশে বড়-ছোট সবাই নাকি সবার নাম ধরে ডাকে। সাহেবটি আমাদের সঙ্গে একদিন নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের চিতাস্থান দেখতে গিয়েছিল। আর একদিন আমাদের কয়েক বন্ধুকে খাইয়েছিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেই প্রথম আমার জীবনে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পা দেওয়া। পরের পয়সায় খুব খেয়েছিলাম সেদিন!

সেই সাহেবটি আমাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছে? কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। কলকাতায় ওর তো কম লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তবু আমাকেই পছন্দ করলো কেন? আমার মুখখানা গোল, সেইজন্য? অচেনা লোকের সঙ্গে আমি এমনিতেই বেশী কথা বলতে পারি না, তারপর ইংরেজিতে বলতে হলে তো কথাই নেই!

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি সত্যি হয়, তবে এরকম সুযোগ মানুষের জীবনে বেশী আসে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে কী করতে হবে? ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম ব্যাপারটি কি? বিশ্ববিদ্যালয় যখন, তখন আমাকে ছাত্র বা মাস্টার হতে হবে নাকি? অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ছাত্রজীবন শেষ করেছি, আবার কিছুতেই স্কুল কলেজের ছাত্র হতে পারবো না! সে আমায় যে যতই লোভ দেখাক। মাস্টার হবার মতনও যোগ্যতা আমার নেই। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে হলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবো! বেশীক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতে গেলেই আমার বুক ধড়ফড় করে, কানে কট্‌কট্‌ করে, হাঁচি পায়, পেট কামড়ায়।

এমনও হতে পারে, চিঠিটা ভুল করে আমার কাছে এসেছে। বুড়ো সাহেব অন্য কারুর কথা ভেবে ভুল করে আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো হোমরা-চোমরা লোকদেরই নেমন্তন্ন আসে। আমি একটা সাধারণ বেকার—কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করিনি। কথাটা ভেবেই খুব নিরাশ হয়ে পড়লাম। দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, ভুল করে চিঠিটা এসেছে আমার কাছে! যদি সত্যি একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করতাম!

যাই হোক, এসব পরে ভাবা যাবে। কয়েকখানা পুরনো বই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিলাম কলেজ স্ট্রিটে। পকেটে একদম পয়সা না থাকলে কি এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা যায়! কফি হাউসের সামনে হীরেন আর স্বপনার

সঙ্গে দেখা। ওরা সদ্য কফি হাউস থেকে নেমে এসেছে। আমি ওদের বললাম, 'চল, আবার চল, আমি তোদের মাটন ওমলেট খাওয়াবো।'

সত্যি হোক মিথ্যে হোক, আমার পকেটে একটা আমেরিকার নেমন্তন্ন চিঠি। এই উপলক্ষ্যে কারুকে কিছু খাওয়াতে না পারলে কি মন ভরে?

ছেলেবেলা থেকে কত স্বপ্ন দেখেছি বিদেশে যাবার। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে ভেবেছিলাম, জাহাজে আলুর খোসা ছাড়াবার চাকরি নিয়ে একদিন সমুদ্রে ভেসে পড়বো। তা আর হয়নি, স্কুল কলেজে পড়াশুনো করার যাবতীয় দোষ আমার ঘাড়ে চেপে বসে গেল। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধু অসিত হঠাৎ জার্মানি চলে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, অসিত, আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিস, যে-কোনো চাকরি, কুলিগিরি হলেও আপত্তি নেই, শুধু দেশগুলো একটু দেখে আসবো! অসিত চিঠি লিখে জানালো, তুই তো আর্টসের ছাত্র, তাই এখানে কোনো সুযোগ নেই—সায়েন্স পড়লে চেষ্টা করা যেত! আর্টস পড়লে নাকি কুলিগিরিও পাওয়া যায় না।

তারপর একবার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, রাশিয়াতে কয়েকজন বাংলা ভাষায় অনুবাদক নেবে। দিলাম দরখাস্ত করে। এক বন্ধুকে ধরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চরিত্রের সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিলাম। তিনি বাঁকা হেসে বলেছিলেন--সার্টিফিকেট দিচ্ছি বটে, কিন্তু ও চাকরি তুমি পাবে না; অনেক বড় বড় লোক এজন্য চেষ্টা করছে। কথাটা প্রায় অভিশাপের মতন ফলে গেল, দরখাস্তের উত্তর পর্যন্ত এলো না!

এখন হঠাৎ এই চিঠি? এ কি মরীচিকা! খড়গপুরে লজ্জাবতী গাছের লতাগুলি ছুঁয়ে বলেছিলাম, এবার একটা কিছু পরিবর্তন দরকার। এই কি সেই?

পরদিন চিঠি লিখে দিলাম, 'আমি যেতে নিশ্চয়ই রাজী আছি। আমার কী করতে হবে আগে জানাও! আমার কী কী যোগ্যতা আশা করছো তাও আমি জানি না।'

সাহেবটি তখন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চার পাঁচদিন পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন শহর থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগলো। এবং নানা রকম ফর্ম, রংচঙে পুস্তিকা। পল্ ওয়েগনার আমাকে জানালো, 'তোমার যা যোগ্যতা আছে তাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি খুশি হয়েছি। তোমাকে পড়াতে হবে না, ছাত্রও হতে হবে না। তুমি তোমার দেশের সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করবে। আমরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান থেকেও এরকম এক একজনকে আনাচ্ছি।'

যেটুকু দোনামনার ভাব ছিল আমার, তাও কেটে গেল আর একটি ঘটনায়। এর মধ্যে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে একটা খাকি খামের চিঠি পেলাম। আমাকে

একটা লোয়ার ডিভিশনের ক্লার্কের চাকরি দেওয়া হয়েছে। চাকরি! এর আগে কত জায়গায় যে ইন্টারভিউ কিংবা পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু পাইনি। হঠাৎ এই সময় চাকরির প্রলোভন! বাড়ির কারুকে কিছু না জানিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম সেই চিঠিটা। কেরানীগিরি করার চেয়ে যে-কোনো জায়গায় পালানো অনেক ভালো। আর গবেষণায় তো ভয় কিছু নেই। গবেষণা মানে তো পাঁচখানা বই দেখে টুকে দেওয়া!

দিন দশেক বাদে বন্ধুদের ব্যাপারটা জানাতেই হলো। না জানিয়ে উপায় নেই।

পাশপোর্ট, ভিসা, ডাক্তারী পরীক্ষা—এরকম নানান ঝামেলা আছে। ওসবের আমি কিছুই জানি না। এক রঙের প্যান্ট আর কোট, যাকে স্যুট বলে, তা আমি জীবনে পরিনি। খুব অল্প বয়সে একটা কোট ছিল, যার নাম তখন ছিল অলেস্টার। এখন তো সোয়েটার আর আলোয়ান দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই। সাহেবদের দেশে তো এরকম চলবে না। গলায় কখনো টাই বাঁধিনি, সেটাও শিখতে হবে।

বন্ধুবান্ধবরা চাঁদা করে প্যান্ট কোট বানিয়ে দিল। রিডাকশন সেলের দোকান থেকে কিনলাম এক জোড়া বুট। আর কিছু গেঞ্জি আর রুমাল—বিদেশে নাকি সুতোর জিনিসের খুব দাম। তারপর সত্যিই একদিন রাত দুটোর সময় দমদম থেকে জেট প্লেনে চড়ে বসলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা বিদায় দিয়ে গেল।

তবু ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় স্বপ্ন। প্যান্ট কোট পরে আমি বিশাল বিমানের জানলার ধারে বসে আছি, ঠিক যেন মানাচ্ছে না। অন্য সব যাত্রীরা বেশ স্বাভাবিক, আমিই একমাত্র আড়ষ্ট। যেন ঝকঝকে পিন কুশানের মধ্যে একটা বাবলা কাঁটা।

পকেটে মাত্র আট ডলার। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কারুকে চিনি না। শুধু ভরসা এই, বিদেশে কোথাও আমি মারা গেলে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আমার মৃতদেহটাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবেন। পাশপোর্ট ফর্মে এইরকম লেখা ছিল।

সীট বেল্ট বাঁধতে পারিনি, অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করবার পর পাশের লোকটি দেখিয়ে দিল। হেমন্ত গলায় টাই বেঁধে দিয়েছে। ঠিকই করে ফেলেছি, টাইয়ের গিঁটটা কক্ষনো আর খুলবো না। রাত্রে শোবার সময় গিঁটশুদ্ধুই টাইটা খুলে ঝুলিয়ে রাখবো, আবার দরকারের সময় পরে নেবো।

করাচী আর বেইরুটে দু'বার থামলো। অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমিও নিচে নামলুম। কিন্তু বেশী দূরে গেলাম না, যদি কোনো গোলমাল হয়ে যায়। মাইক্রোফোনের ঘোষণা ভালো করে বুঝি না। এ তো আর বিনা টিকিটে

ট্রেনে চড়া কিংবা ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে ভ্রমণ নয়।

রোমে চা জলখাবার খেয়ে দুপুরের আগেই প্যারিস। ভাবা যায়! গতকাল এই সময় আমি দমদমের রাস্তায় বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অসম্ভব ভিড়ের জন্য তিনটে বাস ছাড়তে হয়েছিল, আর এখন আমি প্যারিসের বিখ্যাত নীল আকাশের নীচে। বিমান থেকে নেমে গম্ভীরভাবে হেঁটে যাচ্ছি ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে। টাই ঠিক আছে তো? কোটের নিচ দিয়ে জামা বেরিয়ে যায়নি তো? পাশপোর্ট? ওটা হারালেই সর্বনাশ!

প্যারিসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বিমান বদল হবে এখানে। ওর্লি বিমান বন্দরটা চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম, যদি প্যারিস শহরটা একটু দেখা যায়, যদি দেখা যায় ইফেল টাওয়ার। তখন তো জানি না, বিমান বন্দর থেকে শহর অনেক দূরে। তবু যাই দেখি, তাতেই দারুণ উত্তেজনা। প্যারিসের মাটিতে তো দাঁড়িয়ে আছি, স্বপ্নের প্যারিস! প্রত্যেক মানুষেরই নাকি দুটি মাতৃভূমি থাকে। একটা, যেখানে সে জন্মায়, আর একটি প্যারিস। কাছাকাছি যেসব ফরাসীরা ঘোরাফেরা করছে, তাদের সকলকেই আমার কবি কিংবা শিল্পী মনে হয়।

এক সময় শখ করে ফরাসী শিখতে গিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের হুজুগ। বেশী দূর এগুনো হয়নি, তাও এতদিনে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। তবে সেই সময়ই একটা জিনিস শিখেছিলাম, খুব ভালো ফরাসী ভাষা না জানলে ফরাসী-দের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলার চেষ্টা করা একদম উচিত নয়। ওরা ফর্‌ফর্‌ করে এমন কথা বলবে, যার একবিন্দু বোঝা যাবে না। সুতরাং আমি কাউন্টারের সুন্দরী মেয়েটিকে ইংরিজিতেই বললাম—টু পোস্টকার্ড প্লীজ!

বিমান বন্দর থেকে রঙীন ছবির পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা নিয়ম না? সেই জন্যই কিনলাম কার্ড দুটো। কিন্তু কাকে চিঠি লিখবো? একটাতে না হয় বাড়ির চিঠি। কিন্তু আর একটা? কোনো একটা মেয়েকে চিঠি লিখতে পারলে কী চমৎকার হয়! কিন্তু কে সে? আমার জন্য তো কোথাও কেউ প্রতীক্ষা করে বসে নেই। কোনো মেয়ে তো আমাকে কখনো নিভৃত সময় দেয়নি। মন খারাপ হয়ে যায়! যেসব মেয়েদের চিনি, তারা সবাই অন্য কারুর না কারুর বান্ধবী। কলম খুলে বসে রইলাম চুপ করে।

কাছাকাছি কত লোভনীয় দোকান। কিন্তু কিছু কেনার সাহস নেই। আট ডলার থেকে কমে সাড়ে সাত ডলার হয়ে গেছে এর মধ্যেই। এখনো অনেক রাস্তা বাকি, কোথায় কী লাগবে জানি না। কলকাতায় একজন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুশো ডলার মানে আসলে কত? তিনি বলেছিলেন, দুশো ডলার মানে দুশো টাকা। আমাদের দেশে ডলারের যা দামই হোক, আমেরিকার এক ডলার মানে এক টাকা! তাহলে ওখানে দুশো টাকায় আমার একমাস চলবে

তো? যে কেরানীগিরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিলাম, তার মাইনে ছিল দুশো সাতাশী টাকা।

হেসাডিতে বেড়াতে যাবার সময় তবু বত্রিশ টাকা আমার সংগে ছিল। এখন পকেটে মাত্র সাড়ে সাত ডলার নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি চোদ্দ হাজার মাইল দূরে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তের মতনই, যদি পল্ ওয়েগনারের সংগে আমার কোনোক্রমে দেখা না হয়?

হঠাৎ শুনলাম, মাইক্রোফোনে আমার নাম ঘোষণা করছে। প্রথমে মনে হলো, ভুল শুনছি। এ কখনো হতে পারে? আমার নাম ধরে কে ডাকবে? কেন ডাকবে? আবার কয়েক মিনিট পরে সেই ঘোষণা. যদিও বীভৎস উচ্চারণ, তবু আমার নাম ঠিকই। দৌড়োলাম সিঁড়ির দিকে। তখন আমার পেছন থেকে কেউ আমাকে ডাকলো। কাউণ্টারের সেই সুন্দরী মেয়েটি। আমি পাশপোর্ট সমেত আমার হাতব্যাগ ফেলে যাচ্ছি। মেয়েটিকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আবার ছুটলাম।

একটা বিমান ছাড়বার জন্য গজরাচ্ছে। আমাকে দেখে একজন লোক তড়বড় করে অনেক কিছু বলে গেল, একটি অক্ষরও বুঝলাম না। অতি দুঁদে ফরাসী! এরকম অবস্থার জন্য তৈরি ছিলাম আগে থেকেই। মুখস্থ করা বাক্যটা বললাম, ‘জ্য ন্য পার্ল পা ফ্রাঁসে!’ আমি ফরাসী জানি না!

লোকটা আমার একথাও বুঝতে পারলো না। আবার সে বাক্যবন্যা শুরু করলো। আমি এবার প্রায় বানান করার মতন করে উচ্চারণ করলাম, আ-মি ফ-রা-সী জানি-না-না!

তখন সে আর একজনের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লো। সে ইংরেজি জানে। সেই লোকটি আমাকে খুব মিষ্টি করে বললো, ‘ভদ্রমহোদয়, ঐ যে আপনার বিমান ছেড়ে যাচ্ছে!’

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেদিকে ছুটতে যাচ্ছিলাম. লোকটি আমার হাত চেপে ধরে বললো, ‘আপনার কী মাথা খারাপ? দেখছেন না সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে!’

—তা হলে আমি কী করে যাবো?

—আপনি যেতে পারবেন না!

আমার ইচ্ছে হলো প্রচন্ড গর্জন করে বলি, ‘আবার সিঁড়ি লাগাও! আমাকে যেতেই হবে!’

মিনমিন করেই বললাম কথাটা। কিন্তু একবার সিঁড়ি সরিয়ে নিলে আর নাকি লাগাবার নিয়ম নেই। আমারই চোখের সামনে বিমানটা আমার সুটকেশ পেটে নিয়ে উড়ে গেল।

আসলে বেইরুটের পর আমি ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে ভুলে গেছি! সময়ে

গোলমাল হয়ে গেছে আমারই! ছোটকাকার ঘড়িটা ধার করে এনেছি, বেশী নাড়াচাড়া করতেই ভয় করে।

বাস থেকে একবার নেমে পড়লে সেই টিকিটে যেমন অন্য বাসে চাপা যায় না, প্লেনের বেলাতেও সেই নিয়ম নাকি? এরকম সন্দেহ একবার উঁকি মেরেছিল মনের মধ্যে। জামাকাপড়ের সুটকেশটাও চলে গেল। পকেটে সাড়ে সাত ডলার নিয়ে প্যারিসে আমি পরিত্যক্ত। এবার?

সেরকম কিছু হলো না অবশ্য। দেড়ঘণ্টা বাদে আর একটি বিমানে আমাকে তুলে দেওয়া হলো। এবার সাড়ে সাতঘণ্টা অবিরাম উড়ে যেতে হবে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে। প্রত্যেকবার বিমান ছাড়ার পরই একটি মেয়ে এসে নেচে নেচে দেখায়, অ্যাকসিডেণ্ট হলে কীভাবে লাইফ জ্যাকেটটা খুঁজে নিয়ে পরতে হবে, কোন্ দরজা দিয়ে লাফাতে হবে। কোনোদিন এইভাবে কেউ বেঁচেছে বলে শোনা যায়নি।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক আকাশের মতনই নীল বিশাল মহা সাগর। মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। যদি মরতেই হয়, তবে সমুদ্রে ডুবে মরতে আমি পছন্দ করবো। ক্রমে আটলাণ্টিকও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। এখন শুধু মেঘ। ধপধপে সাদা। বিমানটি এখন এভারেস্টের চূড়ার থেকেও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই মেঘের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হয় এটা যেন আর একটা পৃথিবী, এখানেও মাঠ, পাহাড়, বাড়ি, দুর্গ রয়েছে—শুধু সব কিছুই সাদা আর ঘুমন্ত।

বিকাল থেকে সন্ধে হলো, তারপর রাত হয়ে গেল, খেয়ে নিয়ে অনেকে ঘুমিয়ে পড়লো। এবং তার খানিকটা বাদে নিউ ইয়র্কে যখন পৌঁছোলাম, তখন সেখানে সন্ধে। আইড্‌ল ওয়াইল্ড বিমান বন্দরটি এত বড়, এত আলো, এত মানুষজন যে, প্রথমটায় দিশেহারা হয়ে যেতেই হয়। আমার সুটকেশটা খুঁজে বার করাই প্রথম কাজ। কিন্তু তার আগেই একজন আমায় দাঁড় করিয়ে দিল একটা কাউণ্টারের সামনে। হাত বাড়িয়ে বললো, প্লেট?

ভাগ্যিস এক্স-রে প্লেটটা সুটকেশে না রেখে বাইরেই রেখেছিলাম; এক্স-রে প্লেট না দেখে ওরা কারুকে দেশে ঢুকতেই দেয় না। জোরালো আলোয় অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখে লোকটি পছন্দ করলো। তারপর চালান করে দিল আরেক কাউণ্টারে। সেখান থেকে আর একটায়। ব্যাগাটেলির গুলির মতন এইরকম ঘোরাঘুরি চললো কিছুক্ষণ। সুটকেশটাও উদ্ধার হলো। কাস্টমস চেকিং-এর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি শিকাগো যাবো, কোন্ দিক দিয়ে?'

লোকটি গম্ভীরভাবে বললো, 'টেক অ্যাল!'

এই প্রথম আমেরিকান ইংরিজির ভালোমতন স্বাদ পেলাম। অ্যাল আবার

কী জিনিস? সব কিছু ছোট করে বলা এদের স্বভাব। আমরা চিরকাল শুনেছি, আধ ঘণ্টার ইংরিজি হাফ অ্যান আওয়ার, এরা বলবে হ্যাফ আওয়ার। এমন কি, বাঘকে বলবে ক্যাট।

এক লোককে দু'বার জিজ্ঞেস করে বোকা বনার চেয়ে আর একজনকে আবার ধরলাম। সেও বললো, 'টেক অ্যাল!'

তারপর আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হোয়াট ইজ অ্যাল?'

অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেল। বিমান বন্দরটা এত বড় যে একদিক থেকে আর একদিকে যেতে বাস লাগে। আমেরিকান এয়ার লাইনসের বাস ধরলে সেটা নিয়ে যাবে তাদের প্লেনের কাছে। সেটা যাবে শিকাগো। ঐ কম্পানির নামই সংক্ষেপে অ্যাল।

শিকাগোয় পৌঁছোলাম রাত বারোটায় প্রায়। এখান থেকে আবার ছোট প্লেন। এবারে কাউন্টারের লোকটি জানালো, সে তো কাল সকালে! আজ রাত্রে আর কোনো প্লেন যাবে না।

তাহলে রাতটা কোথায় কাটাবো?

তখন আমি একটা দারুণ নির্বোধের মতন কাণ্ড করলুম। আমি কত রাত মাঠে, গাছতলায় কিংবা শ্মশানঘাটে শুয়ে কাটিয়েছি, আর একটা রাত যে এয়ার পোর্টেই কাটানো যায়, সেটা আমার মাথায় এলো না। আমি ভাবলাম, সাহেবদের দেশে বোধ হয় কেউ বাইরে থাকে না! চমৎকার সব গদি মোড়া বেঞ্চ, সুটকেশটা মাথায় দিয়ে অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়া যায়, কিন্তু তাহলে যদি কেউ আমাকে কাঙাল ভাবে? এয়ারপোর্টটা একেবারে নির্জন হয়ে এসেছে, আমি ছাড়া আর একটিও যাত্রী নেই।

কাউন্টারের লোকটিকে বললাম, 'আমার জন্য একটা হোটেল ঠিক করে দিতে পারো?'

সে বললো, 'ঐ তো অ্যাপ্রুভড্ হোটেলের লিস্ট টানানো আছে। তুমি ফোন করো।'

সেইসব হোটেলের রেট কুড়ি থেকে সত্তর ডলার। কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম, 'কাছাকাছি কোনো ছোটখাটো হোটেল নেই। শুধু রাতটা থাকবো, কাল ভোরেই আমার প্লেন।'

সে বললো, 'আট দশ মাইলের মধ্যে দু'একটা হোটেল আছে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখছি তোমার জন্য।'

গল্প উপন্যাসে পড়েছি শিকাগো বিখ্যাত গুণ্ডাদের জায়গা। এত রাত্রে পথে ঘুরে ঘুরে হোটেল খুঁজতে ভয় করবে। তাছাড়া সবচেয়ে কাছের হোটেল-টাই নাকি আট দশ মাইল দূরে।

লোকটি ফোন নামিয়ে বললো, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার জন্য গাড়ি আসছে।'

—ওদের রেট কত?

—খুব রিজনেবল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা গাড়ি এসে থামলো, হর্ন বাজলো। লোকটি বললো, 'ঐ যে তোমার গাড়ি এসে গেছে।'

দশ মাইল দূরের হোটেল থেকে এত তাড়াতাড়ি গাড়ি আসে কি করে? সে কথা জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। গাড়িটা জোরে জোরে হর্ন দিতে লাগলো।

সুটকেশটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বড় ভ্যানের মতন নীল রঙের গাড়ি। ড্রাইভার একটি নিগ্রো, আর কেউ নেই। সে আমার সুটকেশটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে সামনে এসে বসবার ইঙ্গিত করলো।

নিগ্রোটি প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, চকচকে চামড়ার পোশাক পরা, অবিকল একটি দৈত্য। গাড়ির মধ্যে একটি যন্ত্র থেকে মাঝে মাঝে কে যেন কথা বলছে, নিগ্রোটি তার উত্তরও দিচ্ছে। বুঝলাম, হোটেল থেকেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে। গাড়িটা রাস্তাতেই ঘুরছিল, হোটেল থেকে তাকে বলে দেওয়ায় সে অত তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সে একটু দেরি করে এলে আমি অনেক লজ্জা থেকে বাঁচতাম।

রাস্তার পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এই আমার প্রথম আমেরিকা দর্শন। কিছুই দেখা যায় না, বেশ চওড়া একটা আলো-ঝলমল রাস্তা, দু'পাশে অন্ধকার মাঠ। যে-কোনো দেশের রাস্তাই এরকম।

নিগ্রোটি কোনো কথা বলে না। সে একটা চুরুট টানছিল, এক সময় সেটা ফেলে দিল। সেই সুযোগে আলাপ জমাবার ছুতোয় আমি বললাম, 'তুমি কি আমার দেশের একটা সিগারেট খাবে?'

ভেবেছিলাম, নিগ্রো যখন, নিশ্চয়ই কড়া সিগারেট পছন্দ করবে। এগিয়ে দিলাম চারমিনারের প্যাকেট।

সে সন্দিগ্ধভাবে প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর একটা সিগারেট নিয়ে ফটাস করে লাইটার জেবলে ধরালো।

আমি বললাম, 'তোমার ভালো লাগছে? তা হলে তুমি পুরো প্যাকেটটা নিতে পারো।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে সে বললো, 'ম্যান! দিস ইজ পোয়জন।'

সিগারেটের ব্যাপারে সুবিধে হলো না। তখন সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'যে হোটেলে যাচ্ছি, তার ভাড়া কত?'

—সিঙ্গল রুম দশ ডলার। দু'ডলার গাড়ি ভাড়া!

তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া উচিত ছিল। ষাট-সত্তর মাইল গতিতে গাড়ি ছুটছে, আত্মহত্যা করার জন্য ধরণীকে আর দ্বিধা হতে হতো না!

আমি বললাম, 'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!'

—হোয়াট?

নিগ্রোটির সাদা দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু আমি তখন ভয়-ভাবনার ঊর্ধ্বে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। অনেক দারিদ্র্য সহ্য করেছি কিন্তু কখনো কারুর কাছে দীনতা প্রকাশ করিনি। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে তাই করতে হবে?

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, 'আমার কাছে অত টাকা নেই।'

রাস্তার ডান দিকে খুব জোরে গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গেট পেরুতে পেরুতে সে বললো, 'হিয়ার ইউ আর!'

হোটেলের কাউন্টারে একটি মাত্র লোক জেগে আছে। বাইশ-তেইশ বছরের একটি তরুণ, নীল চোখ, চুলগুলো রুপোলি, ঠিক কোনো দেবতার মতন রূপবান। এই সুন্দর চেহারার ছেলেটি সিনেমায় নায়ক না হয়ে হোটেলের কেরানি হয়েছে কেন?

তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে হাত বাড়িয়ে বললো, ইয়োর পাশপোর্ট প্লিজ!'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম একটুক্ষণ। কী রকম যেন বিষণ্ণ। আমিও মুখটা বিষণ্ণ করে বললাম, 'আগে একটা কথা বলি? একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে! আমি আজই এদেশে এসে পৌঁছেচি। আমার কাছে বেশী টাকা নেই। আগে রেট জানলে আমি এখানে আসতাম না।'

ছেলেটি আমার সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল দেখালো না। আমি কোন্ দেশ থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কিছুই জানতে চাইলো না। বোধহয় ওর ঘুম পেয়েছিল। রাত প্রায় একটা। সে শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে বললো 'তুমি এখন কী করতে চাও?'

—কাল ভোর ছ'টার সময় আমার প্লেন। সেই প্লেন ধরতেই হবে। আমাকে যদি এখনই এয়ারপোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমি গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতে পারি। নিজে থেকে কোনো গাড়ি ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ছেলেটা এবার হাসলো একটু। বললো, 'সেটা সত্যিই অসম্ভব। তোমার কাছে যা টাকা আছে দাও!'

আমি সাড়ে সাত ডলার বার করে দিলাম। সে সাত ডলার নিয়ে বাকী পঞ্চাশ সেন্ট আমাকে ফেরত দিয়ে বললো, 'এটা রেখে দাও কাল সকালে সে

তোমার সুটকেশ গাড়িতে তুলে দেবে, তাকে টিপস্ দিও।'

—না, না। আমার সুটকেশ আমি নিজেই তুলে নিতে পারবো।

—তা হলেও। তুমি রাত্রে কিছু খাবে না?

—না, খাবারের দরকার নেই।

—এসো. তোমায় ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালে আমাকে কেউ ডেকে দেবে তো? প্লেনটা না ধরতে পারলে কিন্তু—

—কোনো চিন্তা নেই। এখান থেকে আরও লোক যাবে।

ছেলেটিকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারলাম না। বললাম. 'বাকি টাকাটা আমি পরে দিয়ে দিতে পারি।

—তার দরকার হবে না।

হোটেলটাতে অন্তত পঞ্চাশখানা ঘর. কিন্তু বাড়িটা একতলা। লাল ইঁটের দেয়াল, প্রায় আগাগোড়াই আইভি লতা দিয়ে মোড়া। আমার ঘরে ঢুকে আমি একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেললাম। অনেক. অনেকক্ষণ বাদে আমি নিশ্চিন্তভাবে একা। গত রাত্রে প্রায় এই সময়েই দমদমে প্লেনে চেপেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। আমার আয়ুর সঙ্গে বেহিসেবী অতিরিক্ত দশ-বারো ঘণ্টা যোগ হয়ে গেল। এখন কলকাতায় আগামী কালের দুপুর।

এতটা সময় একই জামাকাপড় পরে আছি। এমন কি জুতো-মোজা পর্যন্ত। টেরিলিনের জামা গায়ে চিটচিট করছে। গরমও লাগছে খুব। শীতের দেশ বলে সবাই বেশ ভয় দেখাচ্ছিল. কিন্তু এখন পর্যন্ত একটুও শীত পাইনি।

ঘরটা আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। এক পাশে টেলিভিসন সেট। বিছানার চাদরটা যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ। মাথার কাছে টেলিফোন ও বাইবেল। টেলিভিসনটা একটা নতুন খেলনা। আগে এটা নিয়ে আমি কখনো খেলিনি। সুতরাং প্রথমেই সেটার সুইচ টেপাটেপি করলাম খানিকক্ষণ। অনেকরকম আলোর ঝলক. সমুদ্রের ঢেউ. কিচির-মিচির শব্দ তারপরই দুমদাম গোলা গুলি। যুদ্ধের ছবি।

আট-দশ ঘণ্টা পেটে কিছু কঠিন খাদ্য পড়েনি। নিউ ইয়র্কে বিমান বন্দরে অনেক ভালো ভালো খাবার দোকান ছিল. হুড়োহুড়িতে কিছু খাওয়া হয়নি। শিকাগো আসবার সময় প্লেনে দিয়েছে শুধু এক কাপ কফি।

মোজা খোলার পর খালিপায়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেশ আরাম লাগলো। দরজা খুলে বাইরে এলাম। দু'একটা ঘর থেকে কিছু কথাবার্তা, হাসির টুকরো ভেসে আসছে। লনটা ফাঁকা। মোরাম বিছানো পথ পার হয়ে ছোট বাগানটাতে এলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল বাগানের মাঝখানে একটি মেয়ে

একা বসে আছে। কাছে এসে দেখলাম, মেয়ে ঠিকই. তবে পাথরের, নগ্ন। তার সামনে তবু আমার বলতে ইচ্ছে হলো—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা!'

ভোরবেলা টেলিফোনের আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বিমান বন্দরে যাবার ডাক। ধড়মড় করে উঠে তৈরি হয়ে নিলাম। প্যান্ট কোট চাপিয়ে গিঁট বাঁধা টাইটা গলিয়ে নিলাম গলায়। বাইরে গাড়ি তৈরি। সেই নিগ্রো।

প্লেনটা ছাড়তে কিন্তু অনেক দেরি করলো। কি যেন যান্ত্রিক গোলো-যোগ। ছোট প্লেন। অনেকটা ডাকোটার মতন। জীবনে এর আগে আমি একবারই মাত্র প্লেনে চেপেছি. কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি, এই রকম প্লেনেই। তাতে অবশ্য এয়ার হস্টেসের বদলে একজন ধুতিপরা ঢ্যাঙা লোক চা দিয়েছিল।

প্লেনটা যখন ছাড়লো, তখন মাত্র পাঁচ ছ'জন যাত্রী। অন্যরা দরজার কাছেই বসেছে। অনেক ফাঁকা জায়গা বলে আমি একটু দূরে বসলাম। এই বিমানের জানলা থেকে নিচের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজ সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে চৌখুপ্পি কাটা শস্যের খেত, আর রাস্তার ওপর ডিঙ্কি টয়ের মতন মটোর গাড়ি। ওপর থেকে সত্যি মনে হয়, এই পৃথিবীটা একটা পুতুলের সংসার।

মোটাসোটা এয়ার হস্টেসটি আমাকে একটু ধমকের সুরে বললো, 'সিট-বেল্ট বাঁধোনি কেন?'

একটু অবাক হয়ে গেলাম। সব সময় কৃত্রিম ভদ্রতা করাই তো এদের নিয়ম। বেল্ট বাঁধতে ভুলে গেছি বলে বকুনি খাবো?

একটু বাদে মেয়েটি কফি এনে অন্যদের দিতে লাগলো। সকাল থেকে চা-টা কিছু খাইনি। তেষ্টা পেয়েছে খুব। মেয়েটি কিন্তু অন্য লোকদের কফি দিয়েই থেমে গেল, আমার কাছে আর এলো না। ওখানেই বসে পড়ে গল্প করতে লাগলো অন্য যাত্রীদের সঙ্গে।

মেয়েটি কি আমার কথা ভুলে গেছে! একি হতে পারে কখনো? আমি ঐ দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলাম. যদি চোখে চোখ পড়ে। তাকালোই না। চেঁচিয়ে চাইতে পারতাম। কিন্তু কেন চাইবো? আমার কাছে ন্যায্য টিকিট আছে, তবু কফি দেবে না কেন?

অন্য লোকগুলো দিব্যি কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে হাসাহাসি করছে। হঠাৎ মনে হলো, ওরা আমার সম্পর্কেই কিছু বলছে। নাও হতে পারে। কিন্তু এই রকম অনুভূতি একবার এলে তাড়ানো শক্ত। আমি কান খাড়া ক'রে রইলাম। এই বিমানে আমিই একমাত্র কালো লোক। সেইজন্যই কি অবহেলা করছে আমাকে? কলকাতায় অবশ্য আমাকে কেউ ঠিক কালো বলে

না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে ওদের কাছে কি আমি এ্যানাদার ডার্টি নিগার!

অপমানে গা জ্বলতে লাগলো। এবং খিদে। এইভাবে আমি আমেরিকায় আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছোলুম খাঁটি ভারতীয়ের মতন। ক্ষুধার্ত এবং নিঃস্ব। এখন এয়ারপোর্টে যদি আমার জন্য কেউ অপেক্ষা না করে, তাহলেই খুব চমৎকার ব্যবস্থা হয়।

॥ ৩ ॥

প্লেন থেকে নামতেই দেখলাম একজন লম্বা মতন লোক দু'হাত মেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। পল্ ওয়েগনার।

—ভালো আছো তো? রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয়নি তো? কোনো জিনিস হারাও নি তো?

টানতে টানতে আমাকে নিয়ে এলো বাইরে। একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখিয়ে বললো, 'এই আমার মেয়ে, সেরা।'

মেয়েদের সঙ্গে শেক হ্যান্ড করতে হয় কিনা ঠিক জানি না। হাতটা বাড়াতে গিয়েও একটু অপ্রস্তুত হয়ে রইলাম। মেয়েটিই কপালের কাছে দু' হাত জোড় করে বললো, 'নামাস্‌কার!' তারপর হাসলো। সেই হাসিতেই ব্যবহারটা সহজ হয়ে গেল।

প্যান্টের ওপর নীল একটা গেঞ্জি পরা। সোনালী চুল, তীক্ষ্ম নাক। নাকটা দেখলে একটু অহংকারী মনে হয়, যদিও হাসিটা খুব সরল। সেই গাড়ি চালাচ্ছে।

পেল্লায় গাড়ি। ভেতরটা এয়ার কণ্ডিশানড্ তো বটেই, বোতাম টিপলে জানলায় কাচ আপনি বন্ধ হয় বা খোলে। এই রকম একটা জটিল যন্ত্র ঐটুকু একটা মেয়ে কী অবলীলাক্রমে চালায়!

পল্ বললো, 'তোমার জন্য আমি ঘর ভাড়া করে রেখেছি। বেশ ভালো ঘর, তোমার পছন্দ হবে। প্রথমে কয়েকটা দরকারি কাজ সেরেই তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবো।'

প্রথমেই যাওয়া হলো ব্যাঙ্কে। সেখানে তক্ষুনি আমার নামে পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো, একশো ডলার ক্যাশ দেওয়া হলো আমার পকেটে। সব ব্যাপারটা সারতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। ব্যাঙ্কের প্রায় সব ক'টা কাউন্টারেই বসে আছে কয়েকটা ফচকে চেহারার মেয়ে। তারা চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে নাকিসুরে কথা বলে আর অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ফরফর করে টাকা গোনে। এবং একবার মাত্র গুনেই টাকা দিয়ে দেয়। এতকাল আমার ধারণা ছিল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ব্যাপার।

সেখান থেকে বেরিয়ে পল্ আরও কয়েক জায়গায় গাড়ি থামালো। এক একটা দোকান বা অফিসের মধ্যে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে। কোনোবার বলে,

'তোমার গ্যাস কানেকশান দিতে বলে এলাম।' কোনোবার বলে, 'তোমার টেলিফোন লাইন দিতে বললাম।'

তারপর একবার বললো, 'সব হয়ে গেছে। এবার খেতে যাওয়া যাক তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই!'

আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, না, না।'

সৌভাগ্যবশত আমার আপত্তিতে গুরুত্ব না দিয়ে পল্ তখন একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো। টেবিলে বসে বললো, 'কী খাবে বলো?'

এখানে কী খাবার পাওয়া যায়, তা কি ছাই আমি জানি নাকি? আমি কী করে বলবো? সেরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ও যা বলবে।'

সুপ আর হ্যামবার্গার এলো। প্রথম দিনই বেশী খাওয়া উচিত নয় বলে আমি পেটে খিদে রেখে পাতে অনেক কিছু ফেলে রেখে বললাম, 'ও! পেট ভরে গেছে।'

পল্ বললো, 'চলো, এবার তোমার বাড়ি দেখে আসি। এখন সেখানে বিশ্রাম নাও, বিকেলবেলা আমি আবার আসবো।'

তিনতলা কাঠের বাড়ি। এদিকে অনেক বাড়িই কাঠের। তবে নানারকম আকারের। আমার ঘরটা দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পল্ চাবি দিয়ে দরজা খুললো। দেখলাম, ভেতরে একটি খুব বুড়ো লোক জানলার পর্দা সেলাই করছে।

পল্ বললো, 'এই তো ম্যাক এখানেই রয়ে গেছে। ম্যাক, তোমার নতুন ভারাটে নিয়ে এলাম।'

ম্যাক বললো, 'হাই দেয়ার।'

লোকটি এতই বুড়ো যে শরীরটা কুজো হয়ে গেছে, ভুরু এসে পড়েছে চোখের ওপর। এত বুড়ো লোক পর্দা সেলাই করে কী করে?

পল্ বললো, 'ম্যাক খুব ভালো লোক। আগে আমাদের অঙ্কের প্রফেসার ছিল।'

আমি চমৎকৃত হলাম। কোনো অঙ্কের অধ্যাপককে ভাড়াটের পর্দা সেলাই করতে এর আগে নিশ্চয়ই দেখিনি।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করলাম। তিনি বললেন, 'তোমার রেফ্রিজারেটারে একটু শব্দ হয়, সেটা আমি কালই ঠিক করে দেবো।'

একটা বড় ঘর, একটা রান্না ঘর, বাথরুম, পর্দাঘেরা অনেকখানি জায়গায় ওয়ার্ডরোব। বাড়িটা বড় রাস্তার ওপরে। উল্টো দিকে একটা পেট্রল পাম্প, এদেশে যার নাম গ্যাস স্টেশন। আমার ঘরের জানলায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, এমন কি দূরে একটা নদী পর্যন্ত।

ওরা চলে যাবার পর আমি আমার অ্যাপার্টমেণ্ট খুঁটিয়ে দেখলাম। দেয়াল-

জোড়া একটা মস্ত বড় আয়না। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা টিপেটুপে দেখলাম, এতক্ষণ ধরে ইংরেজি বলার জন্য, চোয়াল-টোয়াল বেঁকে গেছে কিনা!

ধড়াচূড়া ছেড়ে পায়জামা আর গেঞ্জি পরে বাঙালী হলাম। তারপর চটি ফটফট করে সবে মাত্র একটু ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছি, অমনি দরজায় বেল বেজে উঠলো। আবার কে?

দেশেই একজন বলে দিয়েছিল, সাহেবদের সামনে কখনো পাজামা পরে বেরুতে নেই। হয় ড্রেসিং গাউন পরে থাকবে, না হলে পুরো প্যান্ট-সার্ট। ড্রেসিং গাউন আমার নেই। সুতরাং চটপট সেই পাজামার ওপরেই প্যান্ট পরে নিয়ে দরজা খুললাম।

টেলিফোনের যন্ত্র নিয়ে একটি লোক এসেছে কানেকশান দেবে।

মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগে টেলিফোন কম্পানিতে খবর দিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের দেশে টেলিফোন পেতে দশ-বারো বছর লাগে না? ওঃ, সাহেবগুলো কী স্বার্থপর। নিজেদের জন্য সব ভালো ভালো ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আধ ঘণ্টা বাদে আপনা-আপনি টেলিফোন বাজলো। এবার গ্যাস কম্পানির লোক।—আপনার গ্যাসের কানেকশান দেওয়া হয়ে গেছে, একটু টেস্ট করে দেখুন তো।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনটা আগেই দেখেছি। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারিনি। আলমারির মতন উঁচু একটা জিনিস। নিচের দিকের পাল্লা খোলা যায়। ওপর দিকে চারটে উনুন। অনেকগুলো সুইচ, ঘড়ির ডায়ালের মতন কয়েকটা জিনিস, কী রকমভাবে ব্যবহার করতে হয় জানি না। যাই হোক, একটা সুইচ টিপলাম, অমনি সো সো করে শব্দ হতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে ফিরে এসে টেলিফোনে বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানেকশান এসে গেছে, অনেক ধন্যবাদ!

বিকেলের দিকে পল্ আবার এলো। এবার তার সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে। এর বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, বেশ লম্বা, হলুদ রঙের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরা। ব্লাউজের সামনের দিকটা এতখানি খোলা যে সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা করে।

পল্ বললো, 'এর নাম ডোরি। ডোরি ক্যাটজ। খুব ভালো মেয়ে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। তুমি একদিনে অত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছো, নিশ্চয়ই মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। আমার মতন বুড়োর সঙ্গে কথা বললে কি আর মন ভালো হবে?'

ডোরি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। বেশ উষ্ণ হাত। সে বললো, 'গ্ল্যাড টু সি ইউ!'

পল বললো, 'তোমার তো ছোটখাটো কিছু জিনিস কিনতে হবে! সেগুলো ডোরিই তোমাকে বলে দেবে। নতুন সংসার পাততে গেলে মেয়েদের সাহায্য

ছাড়া চলে না।'

একটু পরেই পল বিদায় নিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে। ঘরের মধ্যে আমি আর একটি যুবতী মেয়ে। একদম অচেনা। এর সঙ্গে ঠিক কী রকম ব্যবহার করা উচিত কে জানে!

আমার এই ঘরে খাট নেই। একটা বড় সোফা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম, ঐ জিনিসটার নাম ড্যাভেনপোর্ট, বাংলায় যাকে বলে সোফা-কাম-বেড। বাড়িওয়ালা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অনুযায়ী দুপুরে একবার টেনে খুলেছিলাম। কিন্তু কোনো মেয়েকে কি বিছানায় বসতে বলা উচিত? সেটাকে ঠেলে আবার সোফা বানালাম। তারপর ডোরিকে বললাম, 'বসো।'

ডোরি খুব সপ্রতিভ। হ্যান্ডব্যাগটা নামিয়ে রেখে পায়ের ওপর পা তুলে বসলো। মনে হয়, ওর পা দুটো মোমের তৈরি। মানুষের পা কি এত ধপধপে সাদা হতে পারে?

ডোরি বললো, 'তোমার অ্যাপার্টমেণ্টটার ভাড়া কত?'

—তা তো জানি না!

—এটা আমারও নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কখন খালি হলো টেরও পেলাম না। তুমি কি আজ এসেই পেয়ে গেলে?

—না। পল ওয়েগনারই ভাড়া করে রেখেছিলেন।

—তুমি খুব লাকি দেখছি! আচ্ছা দাঁড়াও, লিস্ট করি, তোমার কী কী জিনিস কিনতে হবে। বিছানার চাদর—তুমি নিশ্চয়ই আগের লোকের চাদরে শোবে না?—বালিশ, একটা কম্বল—আচ্ছা কম্বলটা পরে কিনলেও চলবে—রান্নার জিনিস, সসপ্যান, কেটলি।

ডোরি নিজেই একটা লম্বা লিস্ট বানালো। তারপর বললো, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ মোলায়েম। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলেও দিনের আলো মেলায়নি। ডোরি তার হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি খাও?'

আমি ঘাড় নেড়ে ওর প্যাকেট থেকে একটা তুলে নিলাম। ডোরি লাইটার বার করতেই আমি বললাম, 'দাঁড়াও! পকেট থেকে দেশলাই বার করে ফটাস করে জেবলে ধরলাম ওর মুখের কাছে। তারপর বললাম, 'এইটাই নিয়ম না?'

ডোরি হেসে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তবে আর একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। তুমি কলকাতার মতন অত বড় শহর ছেড়ে এই গ্রামে আসতে গেলে কেন?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এটা গ্রাম?'

রাস্তাগুলো চৌরঙ্গির মতন চওড়া, দু' পাশে অনেক বেশী আলো,

ছবির মতন সুন্দর বাড়ি, গ্যাস লাইন, টেলিফোন, ট্যাক্সি—এর নাম গ্রাম?

ডোরি বললো, ‘গ্রাম ছাড়া আর কি?’

—কিন্তু জায়গাটার নাম যে আয়ওয়া সিটি?

ডোরি ঝরঝর করে হেসে বললো, ‘সিটি? লোকসংখ্যা কত জানো? সবসুদ্ধু তিরিশ-বত্রিশ হাজার! তোমাদের ক্যালকাটার কত?’

আমরা সাধারণত লক্ষ-কোটি দিয়ে হিসেব করি। তা এখানে চলবে না। মিলিয়ান মানে যেন ঠিক কত? মনে মনে হিসেব করে বললাম, ‘ছ’ সাত মিলিয়ান হবে!’

ডোরি একটা শিস দিয়ে উঠলো। হাসলে ওর বুক দোলে। দেখা যায় দুটি তুষার মণ্ড। আমার মুখের ত্বকে একটা গরম গরম ভাব আসছে টের পাচ্ছি। চোখ ফেরালাম, রাস্তার দু’ পাশে উইলো গাছে। আস্তে আস্তে বললাম, ‘আমার দরকার ছিল কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যাবার। এই জায়গাটা আমার তো বেশ ভালোই লাগছে।’

—তোমাদের ক্যালকাটা কত পুরোনো? চার হাজার? পাঁচ হাজার?

—না, দুশো আড়াই শো বছর মাত্র!

—রিয়েলি? আমার ধারণা ছিল ইণ্ডিয়ার সব কিছুই চার পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। তোমার বয়েস কত?

এবারে একটা মুখস্থ করা রসিকতা শুনিয়ে দেবার লোভ হলো। বললাম, ‘একটা গীর্জার বয়েসের তুলনায় আমি ছেলেমানুষ হলেও কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বয়সের তুলনায় আমি বৃদ্ধ।’

রসিকতাটি মাঠে মারা গেল প্রায়। কারণ ডোরি ক্রিকেট খেলার নামই শোনেনি। বললো ‘আমার বয়েস সাতাশ।’

আমরা হাঁটছিলাম যে-দিকে, সেদিকে দুপুরে আসিনি। ডোরি বললো, ‘তোমাকে এ অ্যাণ্ড পি চিনিয়ে দিচ্ছি—এর পর থেকে তোমার যা দরকার, এখানেই পাবে।’

—এ অ্যাণ্ড পি কি জিনিস?

—তুমি এ অ্যাণ্ড পি জানো না? আমার ধারণা ছিল, এটা বিশ্ববিখ্যাত। এটা হচ্ছে চেইন সুপার মারকেট। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেখানেই যাও এই দোকান পাবে। সেইজন্যই এই রকম নাম—পুরো কথাটা হলো অ্যাটলাণ্টিক অ্যাণ্ড প্যাসিফিক!

—ডোরি, তোমাকে ধরে নিতে হবে, আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি এর আগে কখনো ভারতের বাইরে যাইনি। এবং সোজা দেশ থেকে এতদূরে উড়ে এসেছি!

—শোনো, তা হলে তোমাকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি। কোনো

মেয়ের সঙ্গে যখন হাঁটবে তখন মেয়েটিকে রাখবে সব সময় ভেতরের দিকে, তুমি থাকবে রাস্তার দিকে। এই যে, এটা হচ্ছে স্ট্রীট সাইড, তুমি এই দিকে যাও। এবং ইচ্ছে করলে তুমি মেয়েটির হাত ধরতে পারো!

ডোরি খপ করে আমার একটা হাত মুঠোয় পুরে নিয়ে আবার সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে অন্য যে সব ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তারা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে বা কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। কখনো কখনো তারা থেমে পড়ে চুমু খেয়ে নিচ্ছে। সেদিকে তাকানো উচিত নয় বলে আমি বারবার চোখ ফেরাচ্ছিলাম।

এ অ্যান্ড পি দোকানটা আমাদের কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের প্রায় অর্ধেক। ভেতরে ঢুকে নিজেকেই বেছে নিতে হয়। ফর্দ মিলিয়ে আমরা সব জিনিস কিনলাম। চারটে বিরাট প্যাকেট হলো। বাইরে এসে বললাম, 'দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

ডোরি বললো, 'ট্যাক্সি? এইটুকু তো রাস্তা, হেঁটেই যাবো! তুমি দুটো নাও, আমি দুটো!'

বিরাট বোঝা দুটো ডোরি অবলীলাক্রমে বইতে লাগলো। আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। কোনো সুন্দরী মেয়েকে এত বড় বড় বোঝা নিয়ে আমি আগে কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখিনি, নিজের দেশেও না।

শুধু তাই নয়, আমার ঘরে এসে ডোরি সব কিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে দিল। বিছানার চাদর পেতে, বালিশের ওয়ার ভরে, রান্নার জিনিসগুলো ঠিকঠাক সাজিয়ে অ্যাপার্টমেণ্টটা ঝকঝকে করে তুললো। গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিল কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারপর বললো, 'তোমার জন্য আজ আমি রান্নাও করে দিতে পারি। দেবো?'

ডোরি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা। তাকে দিয়ে এতখানি খাটিয়ে সত্যিই আমার লজ্জা করছিল। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না, না, আজ আর রান্নার দরকার নেই। আজ আমরা বাইরে খাবো। চলো, এখানে যেটা সবচেয়ে বড় হোটেল।'

ডোরি বললো, 'আমি তো খেয়ে এসেছি!'

—কি? খেয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ, আমার তো ডিনার হয়ে গেছে।

যদিও ঘড়িতে আটটা বাজে, তবু আকাশে এখনো একটু একটু দিনের আলো আছে। ডোরি এসেছে সাড়ে ছ'টায়। তার আগেই ডিনার?

ডোরি বললো, 'এখানে সবাই সাড়ে ছ'টায় ডিনার খায়। আমি একটু আগেই খেয়ে নিয়েছি!'

বলেই আবার সর্বাঙ্গে সেই উচ্চকিত হাসি। এই হাসিতে আমি আরও

বোকা হয়ে যাই।

তবু জোর দিয়ে বললাম, 'হোক ডিনার। এত খেটেছো। নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়ে গেছে আবার। চলো, আমার সঙ্গে খাবে চলো।'

—তুমি নতুন বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম!

চমকে উঠে বললাম, 'কোনো দোষ করেছি?'

—কোনো মেয়েকে কেউ এভাবে খেতে বলে না। তুমি ডেটিং কাকে বলে জানো? জানো তার নিয়ম?

—ডেটিং কথাটা শুনেছি ঠিকই। নিয়ম তো জানি না।

—কোনো মেয়েকে যদি তুমি বেড়াতে বা খেতে নিয়ে যাও, তা হলে অন্তত চারদিন আগে তাকে নেমন্তন্ন করবে! ধরো, শনিবার তুমি কোনো মেয়েকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও, তা হলে তাকে বলতে হবে মঙ্গলবার। খুব ঘনিষ্ঠ হলে বুধবারও বলতে পারো। বেস্পতি শুক্রবার বললে তাকে অপমান করা হবে। তাতে মনে হবে, মেয়েটা দেখতে বাজে কিংবা ওকে কেউ পছন্দ করে না —সেইজন্যই ও খালি আছে!

ওরেব্ বাবা, এ যে অনেক ঝঞ্ঝাট। বললাম, 'আমি ক্ষমা চাইছি, ডোরি! আজ সোমবার। আমি আজই তোমাকে আগামী শনিবারের জন্য ডেট করে রাখলাম। কিন্তু এই ক'দিন কি আমি না খেয়ে থাকবো?'

ডোরি বললো, 'না, চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তুমি পোশাক বদলাবে না?'

ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছি বটে, সাহেবরা খেতে যাবার সময় ইভনিং সুট পরে নেয়। কিন্তু আমার তো একটাই প্যান্ট কোট। সুতরাং অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললাম, 'নাঃ, আর এখন জামা-টামা বদলে কি হবে! চলো—'

এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেলের নাম শেরাটন। শুনলাম সাধারণত বাইরের বড় বড় হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা এখানে এসে থাকেন। ডিলান টমাস ছিল এখানে। স্থানীয় লোকেরা বড় একটা যায় না। অনেকটা আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলের মতন।

টেবিলে বসে দু' জনের জন্য এক গাদা খাবারের অর্ডার দিলাম। ডোরিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার জন্য আর কি নেবো? এক বোতল ওয়াইন? স্যাম্পেন?

ডোরি বললো, 'তুমি কি পাগলের মতন অর্ডার দিচ্ছো! এক গাদা টাকা খরচ হবে। তুমি কি ভারতের কোনো মহারাজা-টহারাজা নাকি?'

আমি হাসলাম। এটা বেশ একটা উপভোগ্য রসিকতা। হাসতে হাসতেই বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মহারাজাই! এই সামান্য পয়সা তো আমি দেশে থাকতে যখন-তখন খরচ করেছি!'

বিল হলো ভারতীয় হিসেবে দু' শো সাতাশ টাকা। সেই সঙ্গে বকশিশ

দিলাম তেইশ টাকা (অন্তত টেন পার্সেন্ট, ডোরি ফিসফিস করে বলে দিয়েছিল) —প্রায় একজন কেরানির সারা মাসের মাইনে, আমি যা হতে যাচ্ছিলাম! ডোরির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বেশ একটা অহংকারের ভাব ফুটে উঠলো মুখে। স্যাম্পেনের গুণে মেজাজটাও ফুরফুরে।

রাস্তায় এসে ডোরি বললো, 'এবার তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

—এই রে! তা হলে আমি বাড়ি ফিরবো কি করে? আমি তো রাস্তা চিনি না।

—তা হোক বোকারাম! সব সময় একটি মেয়েকেই বাড়িতে পৌঁছোতে হয় কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে একা ফেরে না। এটা ছোট জায়গা, তুমি ঠিকই রাস্তা খুঁজে পাবে।

ডোরির বাড়ি উল্টো দিকে। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোলাম সেখানে। পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে ডোরি বললো, 'গুড নাইট!'

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে আমিও বললাম, 'গুড নাইট ডোরি!'

ডোরি তবু দাঁড়িয়ে রইলো। নিঃশব্দে হাসছে। আবার কি হলো!

—তোমাকে কত আর শেখাবো? তুমি জানো না, কোনো মেয়েকে বিদায় দেবার সময় তাকে চুমু খেতে হয়? চুমু না খেলে বুঝতে হবে, সারা সন্ধে সেই মেয়েটার সাহচর্য তোমার পছন্দ হয়নি।

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হলো, না, না, ডোরি, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে! শুধু পছন্দ মানে কী, এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য!

কিন্তু চুমু? ঠোঁটে না গালে? আদরের না নিছক ভদ্রতার? নাঃ, সত্যিই আমি একটা বাঙাল। কিছুই শিখে আসিনি।

মুখটা এগিয়ে দিতে ডোরি নিজেই আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট চেপে ধরলো। নরম বিদ্যুৎ। এই সময় কি ওর পিঠে আমার হাতটা দেওয়া উচিত ছিল, বুকে মেশানো উচিত ছিল বুক? কিছুই করলাম না। সেই একটা চুমুর স্বাদ মুখে নিয়ে চলে এলাম। অনেকক্ষণ সেটা লেগে রইলো, আমি সিগারেট ধরালাম না।

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেলাম বাড়ি। যদি গ্রামই হয়, তবে এতগুলো আলো-ঝলমল রেস্টুর‍্যান্ট কেন? অন্তত তিনটে ব্যাংক, চারটে সিনেমা হল চোখে পড়লো। রাস্তাগুলো প্রায় সব একই রকম। চওড়া কংক্রিটের। এরকম গ্রাম ভালো না। গ্রাম হবে জয়নগর-মজিলপুর-চম্পাহাটির মতন।

সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি আবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কি একটা জরুরি জিনিস আনা হয়নি, তাই এক্ষুনি আমার একবার যাওয়া দরকার। টেবিলের ওপর পড়ে আছে আমার রিটার্ন টিকিট। সেটা তুলে নিয়ে কোটটা

গায়ে দিয়ে ছুটলাম এয়ারপোর্টের দিকে। প্লেনে ওঠবার পরই মনে হলো, এই রে, কারুকে তো কিছু বলে আসা হলো না! পল ওয়েগনারও কিছু জানে না। তা হলে যদি আর ফিরতে না দেয়। একবার ফিরলেই তো টিকিট ফুরিয়ে যাবে। তা হলে ফেরা হবে না? আর ফেরা হবে না? প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

জেগে উঠে নির্জন ঘরে এক গেলাস জল খেলাম।

॥ ৪ ॥

সকালবেলা পল ওয়েগনার টেলিফোন করলো, দুপুর বারোটায় বিশ্ব বিদ্যালয়ে যেতে হবে আমাকে! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের একটি পরিচয় সভা হবে। তখনই ঠিক করে ফেললাম, দেশে আমাকে কেউ চিনুক না চিনুক, এখানে বেশ একটা কেউকেটা সেজে থাকতে হবে। এ গাঁয়ের মেধো ভিন্ গাঁয়ের মধুসূদন। আর কেউকেটা সাজার প্রধান উপায় গাম্ভীর্য। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দু'-একটা কথা বলবো মাত্র।

আগের সন্ধেবেলা ডোরি কিনে দিয়েছিল ডিম, সসেজ, পাঁউরুটি, আপেল। সব ফ্রিজে সাজানো। বিলেতের মতন এখানে বাড়ির দরজায় দুধের বোতল দিয়ে যায় না। দোকান থেকে কিনে আনতে হয়। শক্ত মোম-কাগজের ঠোঙায় পাওয়া যায় দুধ। কাল এক গ্যালনের বিশাল এক ঠোঙা কিনে আনা হয়েছে। জন্মের পর মাতৃস্তন্য ছাড়া আর কখনো দুধ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঠোঙার গায়ে প্রোটিন ফর্টিফায়েড, ভিটামিন অ্যাডেড—এরকম নানা রকম কথা। বুঝতে পারলাম, দুধটা জ্বাল দেবার দরকার নেই, একেবারে তৈরি করাই আছে। ওপরে একটা ফুটো করে খানিকটা মুখে ঢাললাম। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। দুধ যে এত সুস্বাদু হয়, তা তো আগে জানতাম না। অনেকটা দুধ খেয়ে ফেললাম। তারপর একটু কষ্ট হলো। আমার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবদেরও যদি এই দুধ খাওয়ানো যেত। ওরা তো এর স্বাদ পেল না! কখনো কোনো ভালো জিনিস খেলে কিংবা ভালো একটা বই পড়লে ইচ্ছে হয়, অন্যদেরও তার ভাগ দিতে। একলা একলা কী কোনো জিনিস ভালো লাগে? যাচ্ছে তাই!

দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করে তৈরি হয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে খুবই কাছে। জানলা দিয়ে ক্যাপিটলের চূড়া দেখা যায়।

একটা ক্ষীণ আশা ছিল, ডোরি হয়তো সকালে একবার আসবে। কিংবা টেলিফোনে খবর নেবে। আমি নির্বোধের মতন ডোরির টেলিফোন নাম্বার লিখে নিইনি! গাইড খুঁজলাম, ওর নাম নেই। হয়তো আমারই মতন নতুন।

পোশাক পরতে গিয়ে একটা হাঙ্গামা হলো। টাইটা গিঁট বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওয়ার্ডরোবে। সেটা বেশী সাবধানে গলায় ঝোলাতে গিয়ে ফাঁসটা খুলে গেল। সর্বনাশ! এখন কি করে টাইটা আবার বাঁধবো?

হেমন্তর কাছ থেকে শিখে আসা উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে হয়নি। টাই ছাড়া কেউ রাস্তায় বেরোয় এখানে? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টা করলাম। কী যেন বলে দিয়েছিল হেমন্ত, প্রথমে ডান হাত, তার ওপর দিয়ে বাঁ হাত—দূর ছাই, আয়নার সামনে আবার হাতগুলো উল্টো হয়ে যায়। এদিকে দেরি হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঢ্যাপলা মতন একটা নট্ বেঁধেই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম মুখ নিচু করে। নিশ্চয়ই সবাই আমার টাই বাঁধা দেখে হাসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন পল ওয়েগনার। প্রথমে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন একটা ঘরে। সেখানে দৈত্যের মতন বিরাট ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুঁচকে মেয়ে। ফট ফট করে কয়েকবার আলো জ্বললো। তারপরই মেয়েটা ক্যামেরার পেছন থেকে কাগজের রীল ছিঁড়ে নিজে খানিকটা রাখলো, আমাকে খানিকটা দিল। দেখলাম, তাতে আমার চার-পাঁচখানা ছবি। একি ম্যাজিক নাকি! যাই হোক, চিন্তা করার সময় নেই। এবার পাশের ঘরে। এখানে একজন ডাক্তার আমার হাঁটুতে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার টোকা মারলো। তারপর জিভ দেখাতে বললো। তারপর বললো—এক্সলেণ্ট। আবার আর একটা ঘরে। এখানে মাঝবয়েসী একজন লোক একটা খাতা খুলে বসে আছে। আমাকে বললো—সই করো। দেখি, সেই খাতায় আমার নাম, বয়েস, ডিগ্রি ইত্যাদি সব লেখা আছে। যেন আমি ফ্রানৎস কাফ্কার কোনো উপন্যাসের জগতে চলে এসেছি। সই করে বেরিয়ে এলাম।

এবার একটা হলঘরে। সেখানে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন্য নানা বয়েসী নারী-পুরুষ। পল ওয়েগনার খুব রসিকতা করছে একজনের সঙ্গে। এরা এসেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে। এবং আমি ছাড়া একজন পুরুষ মানুষও টাই পরে নেই!

লজ্জায় আমার প্রায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা। এতক্ষণ লক্ষই করিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যেও টাইয়ের পাট একেবারে প্রায় উঠেই গেছে। এদের মধ্যে শুধু আমারই গলায় একটা ঢ্যাপলা গিঁট বাঁধা টাই—এখন সকলের সামনে খুলে ফেলাও যায় না! যতটা গাম্ভীর্য অবলম্বন করবো ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশী গম্ভীর হয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম ঘণ্টা খানেক বাদে। আসবার পথে টাইটা গলা থেকে খুলে দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তার পাশে। কলকাতার বাঙালী সাহেবরা যত ইচ্ছে টাই পরুক, আমি আর কক্ষনো সাহেবদের দেশেও টাই-ফাই গলায় দেবো না! খুব শিক্ষা হয়ে গেছে!

এখন লাঞ্চের সময়। কিন্তু আজ আর রান্না শুরু করার ইচ্ছে নেই। সন্ধেবেলা পল ওয়েগনারের সঙ্গে যেন কোথায় যেতে হবে। দুটো ডিম

সেদ্ধ করে দু' স্লাইস পাঁউরুটির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। ফ্রিজে অনেক খাবার মজুত থাকলে দেখছি তেমন খিদেও পায় না। যত খিদে পায় পকেটে পয়সা না থাকলে!

হাতে এখন অনেকটা সময়। কিছু চিঠিপত্র লিখলে হয়। পোস্ট অফিসটা দেখে এসেছি, কিছু খাম-টাম কিনে আনতে হবে। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! চাবিটা তো ভেতরে রেখে এসেছি। দরজায় ইয়েল লক্, টেনে দিলেই তালা বন্ধ—এরকম দরজা তো ব্যবহার করার অভ্যেস নেই! এখন উপায়? দরজা ভেঙে ফেলতে হবে!

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটাই উপায় আছে, বাড়িওয়ালাকে খবর দেওয়া। বাড়ির সামনের রাস্তার উল্টো দিকে গ্যাস স্টেশনে টেলিফোন আছে। গাইডে ম্যাকফারসন ট্রেভেলিয়ান-এর নাম খুঁজে, টেলিফোন যন্ত্রে দুটো ডাইম ফেলে (কুড়ি পয়সা) কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—মিঃ ট্রেভেলিয়ান!

বৃদ্ধ বললো, 'হাই দেয়ার!'

—মিঃ ট্রেভেলিয়ান, আমার নাম এই। আমি তোমার বাড়ির...

বৃদ্ধ আমাকে থামিয়ে দিয়ে খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, 'ব্যস, ব্যস, তোমার আর কিছু বলতে হবে না। তুমি আমার নতুন ভাড়াটে তো? চাবি না নিয়ে এসেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছো তো? প্রত্যেকেই তাই করে! অল ইউ কিডস্ আর দা সেম! শোনো, তোমার দরজার সামনে যে কার্পেট পাতা আছে, সেটার ডান দিকের কোনাটা তুলে দেখবে আর একটা চাবি—কিন্তু শোনো, যদি ও চাবিটা ঠিক ঐ জায়গায় আবার না রেখে দাও, তা হলে তোমার ঘাড় ভেঙে দেবো, ইউ ফলো মি?'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। এত সহজ সমাধান! ছুটে আবার ফিরে এলাম। কার্পেটটা তুলে সবে মাত্র চাবিটা দেখেছি, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ডোরি, সঙ্গে আর দুটি মেয়ে।

ডোরি হাসতে হাসতে বললো, 'কী? চাবি হারিয়ে ফেলেছো নিশ্চয়ই? আমিও প্রথম দিন এসে...'

ঘর খুলে ওদের ভেতরে এনে বসালাম। ডোরির সঙ্গে আর দুটি মেয়েকে দেখে মনে মনে একটু বিরক্তই হয়েছি। একটা মেয়ের সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারি না, তাতে আবার একসঙ্গে তিনজন। আর কথা যদি বলতেই হয়, তা হলে একা একটি মেয়ের সঙ্গে বলাই তো ভালো।

ডোরির সঙ্গের মেয়েদের মধ্যে একজন ফরাসী। অন্য জন আমেরিকান—টেক্সাস থেকে এসেছে। ডোরি আলাপ করিয়ে দিল। ফরাসী মেয়েটির নাম মার্গারিট ম্যাতিউ। গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ফরাসী পড়ায়, তা ছাড়া নিজে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করছে। টেক্সাসের মেয়েটির নাম লিন্ডা হপকিনস্।

টেক্সাসের নাম শুনলেই কাউ বয়দের কথা মনে পড়ে। লিণ্ডার চেহারাও কাউ বয়দের প্রেমিকাদেরই মতন। নীল রঙের জীন্‌স পরা, উজ্জ্বল লাল রঙের জামা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল একটা রিবন দিয়ে বাঁধা, আঁট স্বাস্থ্য। মনে হয়, সে দুদ্দাড় করে ঘোড়া ছোটাতে পারে, বন্দুক চালাতে পারে অবহেলার সঙ্গে।

ফরাসী মেয়েটির চেহারাটা প্রায় পাগলির মতন। মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু অনেক দিন বোধহয় আঁচড়ায়নি। সাধারণ একটা স্কার্ট পরা। পায়ে মোজা। সাজপোশাকের দিকে একটুও যত্ন নেই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, ছাই-চাপা আগুন। এমন রূপ, এমন সারল্য আগে কখনো দেখিনি মনে হয়। চোখের দৃষ্টি ঠিক শিশুর মতন কৌতূহলী।

ডোরি বললো, 'শোনো, ওদের কাছে তোমার গল্প বলছিলাম, তাই ওরা আমার সঙ্গে চলে এলো। মার্গারিট কখনো কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলেনি।'

লিণ্ডা নিজে থেকেই বললো, 'আমি শুনেছি, ভারতীয়রা ভালো চা বানায়। তাই তোমার হাতের চা খেতে এলাম!'

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!'

চা কেনা আছে বটে, কিন্তু টি ব্যাগ। এক চামচে চা দিয়ে একটা করে কাগজের প্যাকেট। ওপরে সুতো বাঁধা। গরম জলে ডুবিয়ে দিলেই হলো। এতে চা বানাবার কোনো কৃতিত্ব নেই। তবু আমি কাপে কাপে দুধ ঢেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কার ক' চামচে চিনি?'

ওরা কেউ কখনো দুধ চিনি মিশিয়ে চা খায়নি। চিনি যে মেশাতে হয় তাই জানে না। আমার তৈরি চ খেয়ে লিণ্ডাও বললো বটে যে, বাঃ বেশ ভালো, চমৎকার—কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভদ্রতা করছে। দ্বিতীয়বার ও আর চিনি মেশানো চা খাবে না।

ফরাসী মেয়েটি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো, 'তোমার ঘরে কোনো বই নেই!'

সত্যি, একটা বইয়ের র‍্যাক আছে বটে, সেটা শূন্য। আমার কাছে বই তো দূরের কথা, একটা পত্র-পত্রিকাও নেই।

সেই মেয়েটি বললো, 'বাড়িতে একটাও বই না থাকলে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় না? ঘরগুলো খুব খারাপ দেখায়!'

আমার ভালো লাগলো ওর কথা শুনে। নতুন আলাপ করতে এসে কেউ এরকমভাবে কথা বলে না।

ডোরি বললো, 'ও তো নতুন এসেছে, বই-টই কেনার সময় পায়নি। শোনো নীল, তুমি লাইব্রেরিতে যেতে পারো। এখানকার লাইব্রেরি খুব ভালো। সকাল

আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখান থেকে তুমি যত ইচ্ছে বই আনতে পারো।'

—যত ইচ্ছে বই?

—হ্যাঁ, অনেকে পঞ্চাশ ষাটখানা বইও এক সঙ্গে আনে। তিনমাস পর্যন্ত রাখা যায়।

খানিকক্ষণ গল্পের পর ডোরি বললো, 'চলো বেরুনো যাক। নীল, তুমি যাবে?'

—কোথায়?

—পাবে। এখানকার অনেকে যায়।

—ছ'টার সময় পল ওয়েগনার আমাকে নিতে আসবে।

—তার তো অনেক দেরি, এখন তিনটে বাজে।

লিন্ডার গাড়ি আছে, সেই গাড়িতে আমরা সবাই মিলে উঠলাম। কী অসম্ভব জোরে গাড়ি চালায় মেয়েটা! দু'তিন মিনিটের মধ্যে পাবের সামনে পৌঁছে গেলাম। লিন্ডা বললো, 'আচ্ছা, তোমরা যাও, বাই বাই!'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকি, তুমি যাবে না?'

লিন্ডা হেসে বললো, 'ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবো না। আমার এখনো একুশ বছর হয়নি।'

লিন্ডার চেহারা দেখে আমি তাকেই সবচেয়ে বড় ভেবেছিলাম। বললাম 'চলে এসো না, কে আর বুঝবে?'

ডোরি বাধা দিয়ে বললো, 'না, তার দরকার নেই। এখানে এসব নিয়ম খুব কড়া। একুশ বছর বয়েস না হলে ঢোকা যায় না। লিন্ডার তো আর মাত্র পাঁচ ছ'মাস দেরি!'

লিন্ডাকে বিদায় জানিয়ে আমরা ভেতরে এলাম। আবছা অন্ধকারে প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া। এখানে শুধু বীয়ার পাওয়া যায়। ছাত্র, অধ্যাপক আর লেখক বা শিল্পীরাই আসে। অনেকটা আমাদের কফি হাউসের মতন। এক টেবিলের একটি জঙ্গলের মতন দাড়িওয়ালা ছেলে সাড়ম্বরে নিজের কবিতা পড়ছে। এখানে ডোরি আর ফরাসী মেয়েটিকে অনেকেই চেনে। আমরা কোণের টেবিলে বসলাম। বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ে উঠে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যেতে লাগল। এ পর্যন্ত শুধু তিনটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, এবার কয়েকটি ছেলের সঙ্গেও অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বের মতন হয়ে গেল। শুনেছিলাম, সাহেবরা সহজে ঘনিষ্ঠ হয় না, এই ছেলেগুলো কিন্তু বেশ খোলামেলা। মার্ক লকলীন নামে একটি ছেলে আমাদের টেবিলে এসে বসলো, সাঙ্ঘাতিক সুপুরুষ, তার খুব ঝোঁক ফরাসী মেয়েটির দিকে। ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায় সে প্রেমের কথা জানাতে লাগলো। মেয়েটা শুধু হাসে

আর বারবার ফরাসীর ভুল শুধরে দেয়।

বার মেড-এর নাম আইরীন। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা। তার কোমরে একটি রেশমী দড়িতে অনেকগুলো ছোট্ট রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, হাঁটলেই চমৎকার শব্দ করে। এক হাতে পাঁচ ছ'টা বীয়ার ক্যান নিয়ে সে অবলীলাক্রমে দৌড়োদৌড়ি করে। যে-কোনো টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ই ছেলেরা ফস্টি-নস্টি করার চেষ্টা করে তার সঙ্গে। কোনো রকম অসভ্যতা নেই, ব্যাপারটা বেশ মধুর। জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল। আসতে হবে তো মাঝে মাঝে

সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ উঠে পড়লাম। ছ'টার সময় পল ওয়েগনার এসে নিয়ে গেল আমাকে একটা পার্টিতে। দুপুরে যাদের দেখেছি, তারাই সেখানে উপস্থিত। এবার টাই পরে আসিনি বলে স্বচ্ছন্দে অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে পারা গেল।

পার্টি থেকে রাত সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পল আমাকে বললো, 'তুমি কিন্তু আজ বাড়ি ফিরছো না। তুমি আমার সঙ্গে আমার গ্রামের বাড়িতে যাবে। ওখানেই দু'দিন থাকবো আমরা। দেশ থেকে এতদূরে এসেই তুমি একলা একলা থাকবে, এটা ঠিক নয়।'

বেশ মজা! বাড়িতে কারুকে বলে আসার দরকার নেই। কেউ আমার জন্য চিন্তা করবে না। আমার তালা দেওয়া ঘরটা বোবা হয়ে থাকবে।

জ্যোৎস্না রাত। চারিদিক পরিষ্কার দেখা যায়। দু'পাশে গমের খেত। প্রায় সমতল ভূমি, কোথাও কোথাও সামান্য ঢেউ খেলানো। এদিকে বাড়ি-টাড়ি বেশী নেই, তবু হঠাৎ দূরে দেখা যায় ছোট্ট একটা গীর্জা, ঠিক যেন আঁকা ছবির মতন।

পলের গ্রামের বাড়িটি আসলে ছোট্ট একটি টিলার ওপরে দুর্গ ধরনের বিরাট একটি প্রাসাদ। বহুদূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে পল আমাকে বললো, 'আমরা এসে গেছি। তবে শোনো, তোমাকে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখি, আমার স্ত্রী যদি হঠাৎ রেগে যান, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বা তোমাকে মারতে যান, তাহলে তুমি কিছু মনে করো না কিন্তু!'

এ আবার কী কথা? যে বাড়িতে যাচ্ছি, সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমাকে মারতে আসবেন? পল কি রসিকতা করছে?

গাড়ি থেকে নেমে পল সন্তর্পণে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। তারপর ভেতরটা খানিকটা দেখে এসে ফিসফিস করে বললো, 'যাক, আমার স্ত্রী মেরি ঘুমিয়ে পড়েছে। এসো আমরা একটা নাইট ক্যাপ নিই, তারপর আমরাও শুতে চলে যাবো।'

এই বুড়ো লোকটি তার বউকে এত ভয় পায়? আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল।

নাইট ক্যাপ কথাটার মানে জানতাম না। পল দুটি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এলো। তারপর একটা বিশাল আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে বসে বললো, 'রিল্যাক্স! দু'দিন আমরা এখানে থাকবো, সাঁতার কাটবো. জঙ্গলে গিয়ে মাছ ধরবো, আমার বন্ধু টম পাওয়েলকে ভুট্টা চাষে সাহায্য করবো. এ বাড়ির বাইরের গেটটা সারাবো—অর্থাৎ শুধু বিশ্রাম। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাজ!'

বিশ্রামের তালিকাটা তো পেলাম, তাহলে কাজটা কি?

পলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কাজটা এখানে ঠিক কী বলো তো? আমাকে কি করতে হবে?'

পল হেসে উঠলো। বললো, 'তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তোমাকে কি আমরা খাটিয়ে মারবো নাকি?'

—না মানে, কাজটা কী ধরনের!

—আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে খুব সোজা। তোমাদের ভাষার সাহিত্য কী রকম হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পর নতুন কী ধারা দেখা দিয়েছে. সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখবে। আর কিছু লেখা অনুবাদ করবে।

—এ কাজ যদি আমি না পারি? কিংবা...

—পারবে না কেন?

—মানে, যদি আমার ভালো না লাগে? ইচ্ছে না হয়?

—তাহলে যখন. ইচ্ছে দেশে ফিরে যাবে। তোমার কাছে তো রিটার্ন টিকিট আছেই। দিস ইজ আ ফ্রি কাণ্ট্রি! ওসব কথা ভেবো না। তোমার ইচ্ছে মতন কাজ করো, যখন যতটা খুশী।

—আসলে, সত্যি কথা বলবো? আমি তো ভালো ইংরিজি জানি না, অনুবাদ কি ভালো পারবো?

—তুমিই ভালো পারবে। কারণ তুমি তোমার ভাষাটা জানো। ইংরিজিতে তুমি প্রথমে যা লিখবে, সেটার ভাষা একটু মেজে-ঘষে দেওয়া যাবে পরে। সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। অন্য দেশ থেকে যারা এসেছে. তাদের কেউ কেউ তো তোমার থেকেও কম ইংরিজি জানে। তুমি যে ইংরিজিতে কথা বলছো. তাই তো যথেষ্ট। আমি তো তোমার ভাষায় কথা বলতে পারি না!

পলের গলার স্বরে এমন একটা শান্ত ভাব আছে. যাতে খুব আশ্বস্ত হওয়া যায়।

ও আবার বললো, 'আসল ব্যাপারটা কি জানো? এই যে প্রোগ্রাম. এর টাকা ইউনিভার্সিটি পুরো দেয় না। এখানে অনেক বড়লোক চাষা আছে. এত বড়লোক যে প্রত্যেকেরই দু-তিনটে নিজস্ব এরোপ্লেন। তাদের কাছ থেকে আমি চাঁদা তুলি। ওদের বোঝাই যে. সাহিত্য-শিল্পের জন্য কিছু দান না করলে পরলোকে গোল্লায় যাবে। পাঁচ দশ হাজার ডলার দেওয়া ওদের পক্ষে

কিছুই না। সেই টাকায় আমি চাই যথাসম্ভব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকদের সাহায্য করতে। তারা যাতে নিশ্চিন্তে এখানে কিছুদিন কাটাতে পারে, ইচ্ছে মতন লিখতে পারে—'

ইস্, এ জন্য আমার থেকে কত ভালো ভালো যোগ্য লোক ছিল! আমি কি কোনোদিন লেখক হতে পারবো? বিশ্বাস হয় না!

সারা বাড়িটা দারুণ নিস্তব্ধ। এত বড় বাড়িতে কি আর লোকজন নেই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মেয়ে, সেরা, সে কোথায়? তোমার আর ছেলেটেলে নেই!'

—আমার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে, মার্গি, তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে কলোরাডোতে থাকে। ছোট মেয়ে সেরা, ওর বিয়ের দিকে মন নেই। ও ভীষণ ঘোড়া ভালোবাসে। আমার একটা ফার্ম আছে এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে, পাঁচটা ঘোড়া আছে সেখানে, সেরাই দেখাশুনো করে। ঘোড়ার গন্ধ ছাড়া ওর ঘুম হয় না। বোধহয়, তাই রাত্তিরেও সেখানেই শোয়!

—একা!

—না, না! কোনো না কোন বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে থাকে নিশ্চয়ই!

এমন নিশ্চিন্ত পিতা আমি দেখিনি কখনো!

আমাকে শুতে দেওয়া হলো ওপরের একটি ঘরে। খাটটা দেখে মনে হলো রাজকুমার-টুমাররা এ রকম খাটে শোয়। সারা ঘরে অসংখ্য বই। এত বই দেখলেই আমার দু'একটা চুরি করতে ইচ্ছে করে। বইগুলি বিভিন্ন ভাষায়। ফরাসী, ইটালিয়ান, এমনকি জাপানী পর্যন্ত। বাংলা একটাও নেই। ওঃ, কতদিন যে বাংলা অক্ষর দেখিনি, কতদিন যে বাংলায় কথা বলিনি!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বাংলায় বলতে লাগলাম—ওহে নীলু চন্দর, কেমন আছো? এসব দেখেশুনে কি মাথা ঘুরে যাচ্ছে? দেখো বাবা! প্রথম দিনই একটা মেয়ে চুমু খেয়েছে! আর যাই করো না কেন, মেম বিয়ে করো না! কবে দেশে ফিরবে? এর মধ্যেই আর ভালো লাগছে না যে!

ভালো লাগছে না? চারদিকে এত ভালো ভালো জিনিস, এত আরাম, তবু ভালো না-লাগার কি কারণ থাকতে পারে? তবু এত স্বাচ্ছন্দ্যও যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়, কী রকম অস্বস্তি লাগে। এত চমৎকার বিছানায় শুয়েও কেন ঘুম আসছে না? কলকাতায় নিজের বিছানায় শুলেই তো...

ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। ঘড়িটা বন্ধ। ক'টা বাজে জানি না। এদের বাড়িতে সবাই কখন ওঠে? যদি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করে? তাড়াতাড়ি নেমে এলাম নিচে। কোনো সাড়াশব্দ নেই! আন্দাজে আন্দাজে চলে এলাম খাবার ঘরে। সেখানেও নেই কেউ। তাহলে বোধহয় আমি খুবই আগে উঠে পড়েছি। আর বিছানায় ফিরে যাবার মানে হয় না। বেরিয়ে এলাম

বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়িয়ে গেল।

চারদিকে নরম আলো। আকাশ কী অদ্ভুত নীল! বহুদূর পর্যন্ত গাছ-পালার সবুজ। তার মাঝখানে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মেপ্‌ল গাছ, তার পাতাগুলো গাঢ় রক্তিম। পরিপূর্ণ শরৎকাল। এদেশে যার নাম অটাম্‌ নয়, ফল, আগেই শুনেছি। মেপ্‌ল পাতার রঙ বদলানো দেখে শরতের আগমন বোঝা যায়।

কয়েকটা চড়ুই পাখি দেখে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চড়ুই পাখি আমার ধারণায় খাঁটি বাঙালী জিনিস। এর পর কয়েকটা কাক দেখতে পেলেই হয়। এমনকি দাঁড় কাক হলেও চলবে। কাক চোখে পড়লো না, কিন্তু গেটের ঠিক পাশেই একটা ম্যাগনোলিয়া গ্লাণ্ডিফোরা গাছে লুকোচুরি খেলছে কয়েকটা বাচ্চা কাঠবিড়ালি। এরাও আমার চেনাশুনো মানুষের মতন, খুব সম্ভব বাংলা বললেও বুঝবে।

টিলার নিচের রাস্তা দিয়ে উঠে আসছে একটা সুদৃশ্য নীল রঙের গাড়ি। ঐ রাস্তা এ বাড়িতেই শেষ হয়েছে। বোধহয় পল ওয়েগনারের কাছে কোনো অতিথি এসেছে। গাড়িটা একেবারে গেটের সামনে থামলো, মিলিটারির মতন পোষাক পরা একটা গাট্টাগোট্টা লোক নামলো এবং চিঠির বাক্সে কতকগুলো চিঠি গুঁজে দিয়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। ও বাবা রে, মোটর গাড়ি চড়া পিওন! আরো কত কায়দাই যে দেখবো!

মুখ ফেরাতেই দেখলাম একজন মহিলা। প্রায় প্রৌঢ়া। ছেলেদের মতন প্যাণ্ট সার্ট পরা, খানিকটা খর্বকায়া। সোজা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

এই নিশ্চয়ই পলের স্ত্রী। কারণ বাড়িতে আর কোনো জনপ্রাণী নেই। ইনি নাকি হঠাৎ রেগে যান, আমাকে মারতে আসতেও পারেন। পাগল? নাকি কালো লোকদের পছন্দ করেন না!

কিছু তো বলতে হবেই! সকালবেলা প্রথম দেখা হলে গুড মর্নিং না বলা এদেশে পাপ। কিন্তু সম্বোধন করবো কি বলে? নামও জানি না।

মায়ের বয়েসী মহিলা, সুতরাং মুখে সেই সম্বোধন এসে গেল। বললাম, 'গুড মর্নিং মাদার।'

ওঃ, এই একটা সম্বোধনের জন্য পরে আমাকে কি হেনস্তাই সহ্য করতে হয়েছিল! আমি নাকি সাংঘাতিক অন্যায় করেছিলাম। মার্কিন দেশে শৈশব কিংবা বার্ধক্যের কোনো মূল্য নেই। সবটাই যৌবন।

মহিলা উত্তর দিলেন, 'গুড মর্নিং।' তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বললে?'

আমি গাড়লের মতন ঐ কথাটারই পুনরুক্তি করলাম!

উনি একেবারে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন, যাকে বলে প্রায় মাটিতে

লুটিয়ে পড়ার মতন অবস্থা। অত হাসি দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সত্যি পাগল নাকি? আমি তো হাসির কথা কিছু বলিনি!

মহিলাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন—মাদার, মাদার, মাদার—আর হাসি। শেষ পর্যন্ত চোখে জল আসায় হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তা মুছতে গেলেন, তখন আমি একটা রুমাল এগিয়ে দিলাম।

একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'তুমিই সেই ইন্ডিয়ান বয়? কি নাম তোমার?'

নাম জানালাম ভয়ে ভয়ে।

—শোনো, আমার নাম মেরি। মিসেস ওয়েগনার। আমি তোমার মাদার নই। এর পর আর কক্ষনো কোনো মহিলাকে মাদার বলো না। নিজের মা ছাড়া আর কারুকে মা বলতে নেই! তুমি আমাকে শুধু মেরি বলবে।

ইংরেজি ভাষায় তুমি-আপনি নেই। বয়েসে যারা অনেক বড়, তাদের শুধু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু উপায় কি? যবনের হাতে পড়েছি যখন, তখন সেই খানাও খেতে হবে।

মেরি অবশ্য রাগ করলো না, মারতেও এলো না। আমাকে খাবারের ঘরে নিয়ে এসে কেটলিতে কফির জল বসালো। তারপর ফ্রিজ থেকে বিরাট লম্বা একটা স্যালামি আর একটা ছুরি আমাকে দিয়ে বললো—কাটো।

স্যালামি আগে খেলেও কাটার অভ্যেস নেই। মোটামুটি চাকা চাকা করে কাটলুম। তারপর পাঁউরুটি কাটতে হলো। এর ফাঁকে ফাঁকে মেরি জিজ্ঞেস করতে লাগলো আমার বাড়ির খবর। তারপর হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা আফশোসের সুরে বললো, 'ইস, তোমাকে স্যালামি কাটতে দিলাম কেন? তুমি তো নিরামিষ খাও!'

—না তো।

—ইন্ডিয়ানরা তো শুধু নিরামিষ খায়!

—অনেকে খায় বটে। কিন্তু আমি...

—তুমি বীফ খাও!

—খাই।

—এর আগে একজন ইন্ডিয়ান এসেছিল এ বাড়িতে—আ রিয়াল ইন্ডিয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া, সে নাকি মস্ত বড় লোক, কিন্তু তার খাওয়া নিয়ে কি ঝামেলা আমার বাড়িতে ভেজিটেবল বিশেষ কিছু থাকে না...তুমি নিশ্চয়ই মোজলেম।

শূকর মাংসের চাক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, 'আমি সবই খাই। আমি গরিবের ছেলে তো, মা বলে দিয়েছেন, লোকের বাড়িতে গিয়ে এটা খাবো না, সেটা খাবো না বলতে নেই। যে যা দেবে সোনা-মুখ করে খেয়ে নেবে!'

মেরি হাসতে হাসতে বললো, 'তুমি সবই খাও? তাহলে এটা দিয়ে আজ ব্রেকফাস্ট করো।'

মেরি একটা প্যাকেট আমার দিকে ছুড়ে দিল। দেখলাম, প্যাকেটটার গায়ে লেখা আছে, ডগ বিস্কিট!

এই দু'দিনেই বুঝে গেছি, আমেরিকানরা সব সময় মজা করতে ভালোবাসে। যে-কোনো বিষয় নিয়েই এরা হাসিঠাট্টা করতে পারে।

সুতরাং মেরিকে মজা দেবার জন্য আমি গ্রাউ, আউ, আউ, গ্রাউ করে খানিকটা কুকুরের ডাক ডাকলাম। তারপর একখানা বিস্কিটে এক কামড় দিয়ে বললাম—ইয়া, আই লাইক ইট!

মেরি ছুটে এসে আমার মুখ থেকে বিস্কিটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'তুমি সত্যি সত্যি খাচ্ছিলে? ভারি দুষ্টু ছেলে তো!'

সকালটা মেরির সঙ্গে আমার ভালোই কাটলো। তবে, পরবর্তী দু'দিনে বাড়িতে যত অতিথি এসেছে, সবার সঙ্গেই মেরি আমার পরিচয় করে দেবার পর বলেছে—জানো, ও প্রথম আমায় দেখে কি কি বলেছিল? বলেছিল, গুড মর্নিং মাদার! তাই শুনে মেরির সঙ্গে সঙ্গে অতিথিদেরও কি হাসি! সেই সময় আমার বোকা বোকা মুখ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

পলের ঘুম ভাঙলো দশটার সময়। একটু পরেই সে একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এলো, হাতে একটা বিদঘুটে যন্ত্র। আমাকে বললো, 'তুমি রেডি তো? চলো!'

কোথায় যাচ্ছি, জানি না। বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। টিলার উল্টোদিক দিয়ে নামলে একটা ছোট মতন জঙ্গল। সেখানে খুঁজে খুঁজে পল একটা শুকনো ওক্ গাছ বার করলো। গাছটা বিরাট, কিন্তু ছাল বাকল খসে গেছে। পল বললো, 'আমাদের এই বাড়িটাতে এখনো ফায়ার প্লেস আছে। এখানে কাঠের খুব দাম। কিনতে গেলে ফতুর হয়ে যাবো। সামনেই শীত আসছে, তাই কিছু কাঠ জোগাড় করে রাখা দরকার।'

তারপর সে গাছটা কাটতে শুরু করলো। তার হাতের যন্ত্রটা একটা ইলেকট্রিক করাত। কী প্রচণ্ড তার শব্দ! কিছুক্ষণের জন্য সেটা আমি ধরে ছিলাম। অতিশয় ভারী এবং এত কাঁপে যে ধরে থাকা রীতিমতন কষ্টকর। এবং করাতের ফলাটার সামনে যদি একবার হাতটা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কুচুং করে উড়ে যাবে। ষাট বছরের বৃদ্ধের এই শখের আমি মানে বুঝতে পারি না। কাঠের দাম-ফাম সব বাজে কথা!

প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় গাছটাকে ভূপাতিত করা গেল। মহাকাব্যের প্রতিনায়কের মতন সে হাত-পা ছড়িয়ে ঢলে পড়লো মাটিতে। পল খুব খুশী।

বড় বড় কয়েকটা ডাল সে আলাদাভাবে টুকরো করে বললো, 'এবার ম্যাক গ্রেগরকে খবর দিতে হবে। সে হচ্ছে প্লাম্বার। সে এসে বলবে, কোন্ কোন্ কাঠ আমাদের গেটটা সারাবার জন্য দরকার হবে।'

ম্যাক গ্রেগর একজন মধ্যবয়সী, শক্ত-সমর্থ লোক। কথা প্রায় বলেই না। তবে দারুণ পরিশ্রমী। তক্ষুনি পলের গাড়িতে দুটো ডাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং গেট সারানো চললো আরও দু'ঘণ্টা। তারপর পল তাকে তার মজুরির টাকা মিটিয়ে দেবার পর বললো, 'ম্যাক গ্রেগর, একটা ড্রিংকস্ নেবে নাকি? দুপুরের খাবারটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে যাও না!'

আমরা তিনজন এক সঙ্গে খাবারের টেবলে বসলাম। কাজ শেষ হবার পর ছুতোর মিস্তিরির সঙ্গে এক টেবলে খেতে বসার ব্যাপারটা গরিব দেশের লোকেরা জানে না।

গ্রাম হলেও জায়গাটার নাম স্টোন সিটি। যদিও এখানেও অধিকাংশ বাড়িই কাঠের। আয়ওয়ার সঙ্গে জায়গাটির তফাত এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যদিও দুটি দৈনিক পত্রিকা আছে। দুটো পত্রিকা পরস্পরের দারুণ শত্রু. প্রতিদিন সকালেই পরস্পরের প্রতি প্রচুর গালমন্দ থাকে। যদিও দুটো পত্রিকারই মালিক এক ব্যক্তি। মালিক সেই টম পাওয়েলের সঙ্গে আলাপ হলো সন্ধেবেলা। বেঁটে মোটাসোটা, খুব হাসিখুশী মানুষ। হাসতে হাসতে বললো, 'এটা কেন হয় জানো? প্রথমে আমার একটাই কাগজ ছিল। অন্য কাগজটা আমার নাম করে খুব গালাগালি দিত বলে আমি সেই কাগজটাও একদিন কিনে নিলাম। তারপর ভাবলাম, এ কাগজটার যদি চরিত্র হঠাৎ বদলাই তাহলে পাঠকরা আর নাও পছন্দ করতে পারে। তাই আরও বেশী কড়া ভাষায় আক্রমণ চলতে লাগলো। অন্য কাগজটা তার উত্তর দেয়। পাঠকরা সেইজন্য দুটো কাগজই পড়ে।'

এই কাহিনী শুনিয়ে টম পাওয়েলের কী হাসি! লোকটি বেশ রসে-বশে আছে, বোঝা যায়। সন্ধের পর তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল খাবার জন্য। মেরি অবশ্য গেল না। মেরি নাকি সচরাচর বাড়ির বাইরে যায় না। টম পাওয়েলের স্ত্রী জেরিও হৈ চৈ খুব ভালোবাসে। সেই রাত্রে আমাদের সুইমিং পুলে নেমে সাঁতার কাটতে বাধ্য করলো। আমার সুইমিং ট্রাঙ্ক নেই, টম পাওয়েলের বিরাট ঢলঢলে একটা ট্রাঙ্ক পরতে বাধ্য হলাম এবং ঝপাং ঝপাং করে হাত পা ছুঁড়ে খুব এক চোট বাঙালী সাঁতার দেখিয়ে দিলাম।

পাওয়েলদের ছেলে নেই, চারটি মেয়ে। পনেরো থেকে সাতাশের মধ্যে বয়েস। চারজনই বেশ সুশ্রী ও চটপটে। পরে জেনেছিলাম, একটি মেয়েও ওদের নিজস্ব নয়, অনাথ আশ্রম থেকে গ্রহণ করা। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়ে শুনলেই আমাদের চোখে অন্য একটি ছবি ভাসে, ঐ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণীদের সঙ্গে একটুও মেলে না। ওরা চারটিই মেয়ে এনেছে, বিয়ে দেবার চিন্তায়

একটুও শুকনো মনে হয় না স্বামী-স্ত্রীকে।

স্টোন সিটি থেকে ফিরে এলাম আড়াই দিন বাদে। পল আমাকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। মেরিও ফিরলো আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সারাক্ষণ উৎকট গম্ভীর।

ওদের গাড়ি আমাকে আমার বাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাড়ি? মাত্র একটা রাত কাটিয়েছি এখানে। তবু যেন বেশ একটা নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি ভাব হলো। এর আগে কক্ষনো আমি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকিনি।

চাবি খুলতে গিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটা কাগজ গোঁজা। একটা চিরকুট. তাতে লেখা আছে. "আমি পর পর দু'দিন এসে তোমাকে খুঁজে গেলাম। তুমি ফেরার পর আমাকে একবার টেলিফোন করবে? বিশেষ দরকার।" ইতি—এম ম্যাতিউ।

এম ম্যাতিউ কে? ঠিক চিনতে পারলাম না। এই ক'দিনের মধ্যে এত লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে যে নাম মনে রাখা খুবই শক্ত। হঠাৎ এত সাহেব মেমের ব্যাপারে কি তাল রাখা যায়? তাছাড়া কে আমাকে অত বিশেষভাবে খুঁজতে পারে?

তক্ষুনি ফোন করলাম। ওপাশে একটি কড়া গলার মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে বললাম. 'এম ম্যাতিউর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

উত্তর এলো—এখন না. এক ঘণ্টা বাদে ফোন করো।

কট করে লাইন কেটে গেল। রহস্যই রয়ে গেল ব্যাপারটা। কে এই এম ম্যাতিউ?

যাই হোক. সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ তো কিছু রান্নাবান্নার চেষ্টা করতেই হবে। ক'দিন ভাত খাইনি। মনে হয় যেন এক যুগ। শুধু সসেজ-ফসেজ খেয়ে কি আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়? প্রথম দিন বাজার করার সময় চাল কিনে এনেছিলাম। দু' পাউন্ডের প্যাকেট। প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে. ইনস্ট্যাণ্ট রাইস. ফুটন্ত গরম জলে এই চাল ফেলে দিলে ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাত হয়ে যায়।

সসপ্যানে গরম জল চাপিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। সত্যিই বেশ চমৎকার যুঁই ফুলের মতন নরম. সাদা ঝরঝরে ভাত হয়ে গেল. ফ্যান গালারও ঝামেলা নেই। এবার? শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। ডাল নেই. মাছ-মাংস নেই. তরি তরকারি নেই। আগের দিন 'এ এ্যান্ড পি'তে দেখে এসেছি এ সবই পাওয়া যায়। এমনকি বেগুন. ফুলকপি পর্যন্ত চোখে পড়েছিল। কিন্তু আনা হয়নি। এখন বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনা যায়. কিন্তু খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। আলু আর পেঁয়াজ আছে. তাই ভেজে নেওয়া যেতে পারে। মাখন আছে

যথেষ্ট। গরম ভাত, মাখন আর আলু ভাজা—খিদের মুখে রাজা-মহারাজারাও এ রকম খাবার পেলে ধন্য হয়ে যাবে! কতদিন মাখন দিয়ে ভাত খাইনি। ভাবলেই চোখে জল এসে যায়।

আলু কুটতে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে ধড়ফড় করে বললাম—হ্যালো।

—আমি মার্গারিট ম্যাতিউ।

ওঃ হো, এ তো সেই ফরাসী মেয়েটি, ডোরির সঙ্গে যে এসেছিল। গলার আওয়াজেই চিনতে পারলাম। ট-গুলো বলে ত-এর মতন, র-গুলো অনেকটা হ-এর মতন।

—আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। কি ব্যাপার বলো তো?

—শোনো নীল, তোমাকে বিরক্ত করছি—খুবই দুঃখিত।

—না, না, বিরক্ত কেন হবো?

—তোমার বাড়িতে কি সেদিন আমি একটা বই ফেলে এসেছি? নাও হতে পারে, মানে বইটা খুঁজে পাচ্ছি না, বইটা ক্লাসে পড়াবার জন্য আমার খুবই দরকার লাগে।

—বই, দাঁড়াও দেখছি।

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল। সোফার পাশে পড়ে গিয়েছিল। আগা-গোড়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি কবিতার বই।

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—সত্যি? ওঃ বাঁচলুম। বইটা এখানে পাওয়া যায় না, যদি হারাতো—

—আমি কি বইটা তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেবো?

—না, না, তুমি কষ্ট করবে কেন? আমিই গিয়ে নিয়ে আসবো। আমি দু'বার গিয়ে তোমায় পাইনি।

—আমি তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাবো, তখন বইটা নিয়ে যেতে পারি।

—ঠিক আছে, হয় সেই সময়, অথবা অন্য কোনো সময় আমি গিয়ে.. অনেক ধন্যবাদ।

॥ ৫ ॥

আবার রান্নাঘরে ফিরে এলাম। আলুর খোসা ছাড়াবার পর পেঁয়াজ কুটতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হলো। কিন্তু ভাজবো কি দিয়ে! তেল তো নেই! দূর ছাই! এর বদলে তো শুধু আলু সেদ্ধ করলেই হতো। পাঁচ মিনিটে কি আলু সেদ্ধ হয়? আলাদা জলে সেদ্ধ করে নেবো? তা হলে আলুগুলো টুকরো টুকরো করলাম কেন? যখন আলুভাজা খাবো ঠিক করেছি, তখন খাবোই। মাখন দিয়েও তো সবই ভাজা যায়।

আর একটা চ্যাপটা প্যান উনুনে চাপিয়ে খানিকটা মাখন ছেড়ে দিলাম। মাখনটা গলবার সময় দিয়ে আমি পাশের ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর কৌতূহল বশে বইটা একটুমাত্র উল্টেছি, এমন সময় ধোঁয়া ভেসে এলো রান্নাঘর থেকে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, প্যানের ওপর মাখনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এত তাড়াতাড়ি? এক মিনিটও হয়নি! আগুনটা দেখে মাথা গুলিয়ে গেল, গ্যাস বন্ধ করার কিংবা প্যানটা নামিয়ে ফেলার কথা মনে এলো না, খানিকটা জল ঢেলে দিলাম দূর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের গোল্লা প্যান থেকে লাফিয়ে ছাদের দিকে উঠে গেল। এখানে প্রত্যেকটি ঘরের দেয়ালে ও ছাদে নানান রঙীন ছবি আঁকা ওয়াল পেপার। ওপর দিকটা কালো হয়ে গেল। সারা বাড়িটা কাঠের তৈরি, আগুন ধরে গেলে কি করতাম জানি না। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা স্রোত নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্যানটা কালো হয়ে গেছে। ঘষে ঘষে খানিকটা পরিষ্কার করে আবার চাপালাম সেটাকে। আলু ভাজা খাবোই। এবার খুব কম মাখন দিয়ে, গলতে না গলতেই আলুগুলো ছেড়ে দিলাম, তারপর পেঁয়াজ, বেশ জল বেরুতে লাগলো, আর ভয় নেই।

রান্না যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন দরজায় শব্দ। এবার আর ভুল করলাম না, গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুললাম। বাইরে যে একটা দেবীমূর্তি দাঁড়ানো! সেই ফরাসী মেয়েটি। মাথার চুল সেরকম আগোছালো। একটা হালকা নীল রঙের স্কার্ট পরা, গাঢ় নীল রঙের চোখ, এবং অদ্ভূত সরল দৃষ্টি।

সে ঘোষণা করলো—আমি চলে এলাম।

—নিশ্চয়ই, এসো, এসো।

দরজা বন্ধ করে মার্গারিটকে ভেতরে বসালাম। তার হাতে একটা বড় প্যাকেট, সেটা টেবলের ওপর নামিয়ে রেখে বললো, 'নিয়ে এলাম তোমার জন্য!'

প্যাকেটের মধ্যে ছ'টা বীয়ারের ক্যান। ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাই জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কি বইটার বদলে?'

—না, না, এমনিই। তুমি বইটা পড়েছো?

—এ তো খাঁটি ফরাসী ভাষায়। আমি বুঝবো কি করে?

—তুমি অনুবাদে নিশ্চয়ই ফরাসী কবিতা পড়েছো? কার কবিতা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

বাংলায় অনুবাদ আছে বলে নির্ভয়ে বললাম—বোদলেয়্যার।

মার্গারিট মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, আমার ওঁর কবিতা একটুও ভালো লাগে না। খুব বড় কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ও তো নাস্তিক! ওর কবিতায় বিশ্বাস নেই, ভালোবাসাও নেই। আমার খুব প্রিয় কবি আপোলিনেয়ার। তোমার ভালো লাগে না!'

একটু ঢোক গিলে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোই তো।'

পাশের ঘরে আমার স্বহস্তে রান্না করা খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে, এখন কি কাব্য আলোচনা চলে? কিন্তু মেয়েটিকে তো কিছু বলতে পারি না। বিশেষত আগের দিন দেখেছি, একে সবাই খুব খাতির করে। তার প্রথম কারণ, এর স্বর্গীয় ধরনের সৌন্দর্য। দ্বিতীয় কারণ, জাতে ফরাসী।

ফট্ ফট্ করে দুটো বীয়ার ক্যান খুলে ওকে একটা দিয়ে নিজেও নিয়ে বসলাম। ও আমার দিকে একটু যেন কৌতূহলের সংগে তাকালো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ফ্রান্সে গেছো?'

—শুধু প্যারিস এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। শহরের ভেতরে যেতে পারিনি।

—কেন?

—পয়সা ছিল না। তবে যাবো নিশ্চয়ই। একবার না একবার। জানো, ওখানকার এয়ারপোর্টে যখন বসেছিলাম, ফরাসী নারী-পুরুষদের দেখে মনে হচ্ছিল, এরা নিশ্চয়ই কবি বা শিল্পী। তুমি কি কবি?

মার্গারিট দারুণভাবে হাসতে লাগলো। ঠিক যেন ঝর্ণার জলের শব্দ। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, 'না, না, আমি কক্ষনো এক লাইনও কবিতা লিখিনি। কবিতা লেখা কি সহজ? আমি পড়তে খুব ভালোবাসি। তোমার ধারণা ফরাসীরা সবাই কবি বা শিল্পী? এয়ারপোর্টে তো বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী কিংবা চোর-ডাকাতরা ঘুরে বেড়ায়!'

একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নিজের শরীরের দিকে চোখ গেল: চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। কি দারুণ কেলেংকারি করে ফেলেছি!

আমি গেঞ্জি ও পাজামা পরে আছি। দরজায় খটখটের পর তাড়াহুড়োতে প্যান্ট-সার্ট পরে নিতে ভুলে গেছি। সাহেব-মেমের সামনে এই পোষাক? শুনেছি, ঠিক মতন সজ্জিত না হয়ে তাদের সামনে এলে তাকে নাকি অপমান করা হয়। ড্রেসিং গাউন-ফাউন একটা না কিনলে আর চলছে না!

এখন কি করবো, দৌড়ে পালিয়ে যাবো? আস্তে আস্তে বললাম, 'কিছু মনে করো না। আমি রান্না করছিলাম তো, তাই পোষাক পরে নেই!'

পোষাকের কথাটা গ্রাহ্য না করে ও ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'রান্না করছিলে? ইণ্ডিয়ান কুকিং?'

যদিও ভাত এবং আলু-পেঁয়াজ ভাজা, তবু ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

—মে আই সি ইট? আমি কখনো দেখিনি!

নিজেই উঠে চলে এলো রান্নাঘরে। আলু আর পেঁয়াজ এক সঙ্গে ভাজার জন্য রংটা লালচে হয়ে গেছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি?'

কী বলবো, ফিংগার চীপ্‌স, ফ্রায়েড পটাটো না পটাটো চীপ্‌স? বললাম, 'ফ্রায়েড পোটাটো অ্যাণ্ড ওনিয়ান!'

রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'মে আই টেস্‌ট ইট?'

হাত দিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে খুব সন্তর্পণে জিভে ঠেকালো। তারপর বললো, 'সে বঁ! সে ত্রে বঁ! খুব ভালো!'

ডোরি বলেছিল, শনিবার খাওয়াতে গেলে মঙ্গলবার নেমন্তন্ন করতে হয়। এ মেয়েটা যে নিজেই খাবার তুলে খাচ্ছে। সুতরাং একে অনায়াসেই আর একটু বলা যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমার সঙ্গে একটু ভাত খাবে? আগে কখনো ভাত খেয়েছো?'

—খেতে পারি একটু। হ্যাঁ, আগে ভাত খেয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু কোনো ইণ্ডিয়ানের নিজের হাতের রান্না তো খাইনি?

ভাতটা তখনো গরম আছে। তার মধ্যে খানিকটা মাখন ফেলে দিয়ে চামচে দিয়ে নেড়ে দিলাম। এই তো ঘি-ভাত হয়ে গেল। দুটো প্লেটে সেই ভাত আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা বেড়ে ফেললাম চট করে। রান্নাঘরে কিছু সসার, প্লেট, কাঁটা-চামচ আগে থেকেই ছিল। আমার অবশ্য খুবই ইচ্ছে ছিল হাত দিয়ে খাবার, কিন্তু খাঁটি ফরাসী মেমসাহেবের সামনে কাঁটা ব্যবহার করতেই হলো। যাই হোক, দিব্যি জমলো খাবারটা। নিজে রেঁধেছি বলে বলছি না, আলু-পেঁয়াজটা সত্যি দারুণ খেতে হয়েছিল; নুন দিতে ভুলে গেছি, তাতে কি! নুন তো পরে মিশিয়ে নিলেই হয়!

খাওয়ার শেষের দিকে ঝড় উঠলো। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ, তারপর পাগলা হাওয়া। মার্গারিট জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে শিশুর মতন কলকণ্ঠে বললো,

'উঃ! কী সুন্দর, কী চমৎকার, এ বছরের প্রথম ঝড়—নীল, তুমি দেখবে এসো—'

আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর্দাগুলো উড়ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। উড়ছে মার্গারিটের মাথার চুল, গায়ের জামা, উড়ে যাচ্ছে ওর কথা। বাইরে উইলো গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখির মতন আকাশে উড়ছে অসংখ্য শুকনো পাতা।

মার্গারিট বললো, 'তুমি একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছো? বৃষ্টি আসবার আগে উইলো গাছগুলো এরকম কাঁদে।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের প্রকৃতির চেয়েও এই নারীটিকে আমার আরও বেশী অপরূপ মনে হয়। প্রকৃতি উদ্দাম হয়েছে বলেই এই মুহূর্তে ওর রূপ আরও বেড়ে গেছে। ওর সর্বাঙ্গ ভরা অজস্র খুশী, যেন তার ঝাপটা এসে লাগছে আমার গায়ে।

খানিক পরেই বৃষ্টি নামলো। আমার ধারণা ছিল, আসাম বা বাংলাতেই বুঝি সবচেয়ে জোরালো বৃষ্টি হয়। বর্ষা যেন আমাদেরই একচেটিয়া। কিন্তু এখানকার বৃষ্টিও তো কম তীব্র নয়। ঝমঝমে শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কথা ছিল, সে প্রশ্ন আর ওঠে না।

সোফার কাছে ফিরে এসে আর এক জোড়া বীয়ারের ক্যান খুললাম। আমার কানের কাছটায় একটু গরম গরম লাগছে। নিশ্চয়ই বীয়ারের জন্য নয়। এখানকার বীয়ার খুব পাতলা, সহজে নেশা হয় না।

মার্গারিট জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি সাকোনতালের কথা জানো? আমাকে বলবে?'

—সেটা কি জিনিস?

—সাকোনতাল, তোমাদের দেশের—

—ঠিক বুঝতে পারছি না!

ও তখন ঝর ঝর করে আবৃত্তি করলো:

> লোপো রইয়্যাল দ্য সাকোনতাল
> লা দ্য ড্যাঁক্‌র স্য রেজুই
> কাঁ ইল লা র‍্যাট্রুভা প্লু পাল......

আমি বললাম, 'ইংরেজি করে বুঝিয়ে দাও!'

—এর মানে—অনুবাদ করা খুব শক্ত...তবু, মানে সাকোনতালের স্বামী, রাজ্য জয় করতে করতে ক্লান্ত, সত্যিকারের আনন্দ পেলেন যখন দেখলেন তাকে (সাকোনতালকে), প্রতীক্ষা ও ভালোবাসায় ম্লান, আদর করছিল হরিণ শিশুটিকে......

আমি আবিষ্কারের আনন্দে বললাম, 'ও, শকুন্তলা! দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা!'

মার্গারিট উজ্জ্বল ভাবে বললো, 'বুঝতে পেরেছো? আপোলিনেয়ারের

কবিতায় আছে...তুমি ওদের পুরো কাহিনীটা জানো?'

আমি হ্যাঁ বললাম। মার্গারিট ব্যগ্রভাবে আমার বাহু ছুঁয়ে বললো 'বলো না! আমাকে বলো ওদের গল্প! কতদিন ধরে আমার জানবার ইচ্ছে. কোথাও পাইনি।'

মহাভারতের নয়, কালিদাসের নাটকের শকুন্তলা-কাহিনী আমি ওকে শোনালাম। মহাভারতের কাহিনীটা তুলনায় অনেক নিরেস। গল্পটা শুনতে শুনতে মার্গারিট এক সময় কেঁদে ফেললো। যেখানে দুঃখিনী শকুন্তলা গেছে রাজসভায়, রাজা তাকে চিনতে পারছেন না, সপারিষদ বসে কটু ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন—সেখানে মার্গারিটের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো। আমি বুঝলাম. ওর চোখ দুটি আসলে ওর মনেরই দুটি ছোট আয়না।

গল্প শেষ করার পর আমি বললাম, 'তুমি একটু বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিলে।'

—হ্যাঁ, কী নিষ্ঠুর অথচ কী অপূর্ব সুন্দর গল্প!

—তোমার জীবনে কি কখনো এরকম হয়েছে? কেউ ভালোবেসে তোমাকে ভুলে গেছে?

ও অবাক হয়ে বললো. 'না তো। আমায় তো কেউ কখনো সেরকম ভালোবাসেনি। আমি তো ভালোবাসার স্বাদই এখনো জানি না।'

কথা ঘোরাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি তোমাকে এত বড় একটা গল্প শোনালাম, এবার তুমি আপোলিনেয়ারের পুরো কবিতাটা আমাকে শোনাও!'

ও বললো. 'নিশ্চয়ই। তুমি শুনবে?'

আপোলিনেয়ারের "লা সাঁজোঁ" দু মালএইমে" বেশ দীর্ঘ কবিতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রণয় কাব্যগুলির মধ্যে একটি। মার্গারিট আমাকে খুব যত্ন করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে শোনাতে লাগলো: ১৯০৩ সালে যখন আমি ঐখানে গিয়েছিলাম, তখন জানতাম না আমার ভালোবাসা সেই সুন্দর ফিনিক্স পাখির মত. এক সন্ধেবেলা তার মৃত্যু হলে পরের সকালটিই তার পুনর্জন্ম দেখে......

এমন চমৎকারভাবে কবিতা পড়া আমার জীবনে আগে কখনো হয়নি। ও যেন প্রতিটি শব্দ. প্রতিটি লাইন অত্যন্ত ভালোবেসে উচ্চারণ করছে। যেন এই শব্দগুলির তুলনায় পৃথিবীর আর সব কিছুই মূল্যহীন। শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আমার মনটা প্রসারিত হয়ে যেন আমার শরীর ছাড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দেখা এবং শোনা—এই দুটো জিনিস মিলেমিশে গেছে। আমি শব্দগুলোকে দেখছি. আর এই বালিকার মতন যুবতীর রূপ যেন গানের মতন আমার ভেতরে চলে আসছে।

মাঝে মাঝে সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য আমাকে উঠে আসতে হচ্ছিল, তাই এক সময় আমি মেঝেতেই ওর কাছাকাছি এসে বসেছিলাম। পুরো কবিতাটা শেষ হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দুজনেই। আমার মনে হলো, এতক্ষণের এই শব্দতরঙ্গ আমাদের দুজনকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আমি মার্গারিটের ঊরুর ওপর আমার মাথাটা হেলিয়ে দিলাম।

ও সেদিকে স্থির ভাবে তাকালো।

আমার মুগ্ধতা আমি কি ভাবে ওর কাছে জানাবো, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ কবিতাটাই যেন ওর অবয়বের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই কবিতাটিকে আরও বেশী উপভোগ করার জন্যই যেন আমার ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হলো।

আমি বললাম, 'এটা আবার একদিন শুনবো। মার্গারিট, মে আই কিস ইউ?'

ওর মুখে একটা পাতলা দুঃখের ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। আমার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ম্লান গলায় বললো, 'আমি দুঃখিত। আমেরিকান মেয়েরা এতে কিছু মনে করে না বটে, কিন্তু আমি পারবো না। আমি মাঝে মাঝে এখানে আসতে পারি, আমরা এক সঙ্গে কবিতা পড়বো, কিন্তু আমার কাছে অন্য কিছু পাবে না।'

আমি তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত গলায় বললাম, 'না, না, তুমি আসবে। আমি আর অন্য কিছু চাই না।'

—তুমি পারবে না।

—নিশ্চয়ই পারবো।

—আমি চেয়েছিলাম তোমার বন্ধু হতে, তোমার কাছে এসে অনেক কিছু জানবো কবিতা পড়বো—কিন্তু আমি তো তার বদলে আর কিছু দিতে পারবো না!

—আমি সেরকম ভাবে চাইনি!

—বাট ইউ মাস্ট প্রমিস।

—নিশ্চয়ই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

—তুমি কিছু মনে করলে না তো? আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম?

—না, না, না।

—সত্যি বিশ্বাস করো, আমি ওসব পারি না। এই যে ছেলেমেয়েদের যখন-তখন শারীরিক আনন্দ, এটা ঠিক আনন্দ নয়—ভালোবাসা ছাড়া কি সত্যিকারের আনন্দ হয়? এরা শরীরকে এত প্রশ্রয় দেয় বলেই শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতে শেখেই না।

আমি চুপ করে রইলাম। একটু বাদে বইটা নিয়ে মার্গারিট উঠলো। বললো, 'যাই, আমাকে একবার হস্টেলে ফিরতে হবে। আজ আমার ঘর সাফ

করার ডিউটি আছে।'

দরজার বাইরে গিয়ে ও আবার বললো, 'আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম?'

ওর চোখ ছলছল করছে। আমি স্বাভাবিক ভাবে বললাম, 'না, না, আমিই বোকার মতন...তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

সিঁড়ির নিচ পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। শরীরে অসম্ভব ছটফটানি! এক একবার মনে হলো, আমি সাংঘাতিক দোষ করেছি। আবার মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষ।

শেষ পর্যন্ত আমার হতাশা ও গ্লানি শুধু রাগে পরিণত হলো। ইচ্ছে হলো, হাতের কাছে যা পাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই! আয়নাটা, কাপ, প্লেট, বাসনপত্তর! কি হবে এসব দিয়ে? কেন বোকার মতন মার্গারিটের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে গেলাম? নিজেকে ক্ষমা করবো কি করে? ডোরি বলেছিল, অনেকক্ষণ এক সঙ্গে কাটাবার পর কোনো মেয়েকে চুমু না খেলে সে দুঃখ পায়। আবার আর একটি মেয়েকে সে কথাটা শুধু উল্লেখ করলেই যে দুঃখ পাবে, তা আমি জানবো কি করে? দূর ছাই, এ ছাতার দেশে আর থাকবো না।

কি হবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে থেকে!

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এই জানলাটা পূব দিকে। এদিকেই তো কলকাতা। কত হাজার মাইল দূরে। তবু আমি জানলা দিয়ে যেন সোজা কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওদের চোখের ভাষা পর্যন্ত আমি বুঝি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। ওখানে আমি জলের মাছ, এখানে কেউ না। চলে যাবো, দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরে যাবো!

॥ ৬ ॥

দিন দশেকের মধ্যেই অনেক কিছু ধাতস্থ হয়ে গেল। চেনা হয়ে গেল রাস্তাঘাট, কোথায় কোন্ দোকান। এমনকি প্রতি শনিবার কোন্ দোকানে রুই মাছ আর ইলিশ-ইলিশ-গন্ধওয়ালা স্যামন পাওয়া যায়, সেটা পর্যন্ত জানা। হ্যালোর বদলে হাই কিংবা হাফ-এর বদলে হ্যাফ বলাও রপ্ত হয়ে গেছে। তবু মনমরা ভাবটা কাটে না।

অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই ছোট্ট জায়গাতেও বাঙালী আছে পঞ্চাশ-ষাট জন, দুই বাংলার মিলিয়ে। কয়েকজন নিজে থেকেই আমার বাড়ি যেচে আলাপ পরিচয় করে গেছে। একজন তো আমার একেবারে প্রতিবেশী, দু'তিনখানা বাড়ি পরে থাকে, রাধারমণ ব্যানার্জি, চন্দননগরের ছেলে। অতিশয় কট্টর বামুন, কেমিস্ট্রির ডক্টরেট হলেও ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন ভীষণ ভাবে। বাড়ির বাইরে কোথাও কখনো রান্না করা জিনিস খান না, এক টুকরো মাছ ভাজাও নয়, কারণ কুকিং অয়েলের মধ্যে যদি কোনোক্রমে গরু বা শুয়োরের চর্বি মেশানো থাকে, তা হলেই জাত যাবে! উনি কখনো বাসে ওঠেন না, কারণ ভিড়ের সময় মেয়েদের গায়ের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যেতে পারে। মেমদের গায়ে নাকি বিশ্রী ঘামের গন্ধ! যার নাম রাধারমণ, সে যে কি করে এরকম অটলবিহারী হয়, সেটাই বিস্ময়ের। বেস্পতিবার ক্ষুর ছোঁয়ানো নিষেধ বলে উনি বুধবার মাঝ রাত্রে উঠে দাড়ি কামান।

রাধারমণ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার কোনোদিক থেকেই কিছু মিল থাকার কথা নয়, শুধু বাংলা ভাষা ছাড়া। ওর বাঙালীত্ব আবার সাংঘাতিক প্রবল, ওর মতে বাঙালীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, জোর করে তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, সত্যজিৎ রায়, ইলিশ মাছ, এবং বাঙালী মেয়ে ওর প্রিয় আলোচ্য বিষয়। ভারতী নামে একটি বাঙালী মেয়ে এখানে এসে একটি ক্যানেডিয়ান ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে উনি সাংঘাতিক মর্মাহত, যেন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের মতন একটা ঘটনা।

লোকটি কৃপণ স্বভাবের। সিগারেট বা চায়ের পর্যন্ত নেশা নেই। তবে একটি মাত্র শখ আছে। নিউ ইয়র্কের একটি পাঞ্জাবীর দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে শর্ষের তেল আনান এবং সারা সন্ধে ধরে অনেক রকম রান্না করেন। বেছে বেছে কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেও খাওয়ান—যদিও আগে থেকেই বলে

দেন, "আমি কিন্তু ভাই তোমার বাড়িতে কখনো খেতে যাবো না, সে ব্যাপারে কিছু মনে করতে পারবে না।" দু' একদিন আমাকেও রান্না করে খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোকটির সংসর্গ আমি খুব বেশীদিন পছন্দ করতে পারিনি।

পর পর কয়েকদিন বেশ কয়েকজনই আমাকে বলছিল, আমার নাকি মুখটা খুব শুকনো শুকনো। অসুস্থের মতন দেখাচ্ছে। অসুখটার নাম হোম সিকনেস।

রাধারমণ ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাইটি, বাড়ির জন্য খুব মন কেমন করছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দাদা, আর ভালো লাগছে না থাকতে! নেহাৎ দৈব দুর্বিপাকে এখানে এসে পড়েছি!'

অভিজ্ঞ ভাবে হেসে বললেন, 'হয় হয়, ওরকম হয়। প্রথম একটা বছর এরকম হয়, কিছুতেই মন টেকে না! তারপর যেই একটা বছর পার হয়ে যায়, তখন আর কেউ এসব দেশ ছেড়ে যেতেই চায় না। ভিখিরির মতন মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, তাও সই!'

—আপনার ক' বছর হলো?

—সাড়ে চার বছর। ঠিক হিসেব করলে চার বছর আট মাস। এরপর কিছুদিন ক্যানাডায় কাটিয়ে আসতে হবে। আমার ভাই সাফ সাফ কথা! পিঁপড়ের মতন টিপে টিপে টাকা জমাচ্ছি, যেদিন এক লাখ ডলার জমবে, সেইদিনই পিঠটান দেবো। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাবো!

—আমার এক বছরও কাটবে না।

—দেখা যাবে। ওরকম অনেক শুনেছি। প্রথম প্রথম এসে সবাই বলে।

—আমি ফিরবোই!

—ঠিক আছে, বাজি রইলো!

প্রত্যেকদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি, আমি দেশে ফিরে গেছি! কফি হাউসে বন্ধুদের আড্ডায় হাজির হয়েছি হঠাৎ। সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে, আরেঃ! কিংবা এসপ্লানেড থেকে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছি ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে, পকেটে তখনও আমার পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট।

টেবলের ওপর সত্যিই আমার রিটার্ণ টিকিট পড়ে আছে। যে-কোনো দিন ফিরে যেতে পারি কলকাতায়। সত্যি যে ঝোঁকের মাথায় চলে যাইনি, তার কারণ পল ওয়েগনার এর মধ্যে আমার একটা নেমন্তন্নের ব্যবস্থা করেছে অ্যারিজোনায়। বেশ দূরের পথ। বেড়াবার নেশা আছে আমার, সেই টানে খানিকটা উত্তেজিত বোধ করি আবার।

মার্গারিটের সঙ্গে দু' তিনবার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে। যখনই দেখা হয়েছে, ও উৎফুল্লভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি সেই নরম হাতটা ধরে মৃদু ভাবে বলেছি—ভালো

আছো? ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার সামান্য অপরাধ-বোধ হয়। মার্গারিট বলেছিল, আবার আমার বাড়িতে কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য আসবে! কিন্তু আর আসেনি, আমিও আসতে বলিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' একদিন অন্তর কিছুক্ষণের জন্য যাই। বাকি সময়টা ঘরে শুয়ে থাকি। পল ওয়েগনারকে জানিয়ে দিয়েছি যে সেই প্রবন্ধটা লেখার কথা চিন্তা করে যাচ্ছি! লাইব্রেরি থেকে একদিনে সত্তরখানা বই এনে সাজিয়ে ফেলেছি ঘর। পড়ার জিনিসের অভাব নেই। তবু নিঃসঙ্গতা কাটে না। পুব দিকের জানলাটার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ঐ দিকে কলকাতা।

ডোরির সঙ্গে এক শনিবার সন্ধেবেলা ডেটিং করা ছিল আগের থেকেই। সেটা রাখতেই হয়। কিন্তু ডেটিং-এর অনুষ্ঠান কি? যাদের গাড়ি আছে তারা চলে যায় খানিকটা দূরের কোনো শহরে, সিডার র‍্যাপিডস কিংবা ডেময়নসে। অথবা কোনো খোলা মাঠের মুভিতে, যেখানে গাড়িতে বসে বসেই সিনেমা দেখা যায়। সিনেমা কেউ বিশেষ দেখে না, গাড়ির মধ্যে চুমু আর জড়াজড়িতেই কেটে যায়। ডোরি বা আমার গাড়ি নেই। সুতরাং এখানেই রাস্তায় রাস্তায় একটু বেড়ানো, তারপর কোনো হোটেলে খেতে যাওয়া। খাওয়ার পর ডোরি বললো, 'চলো, আমার ফ্ল্যাটে চলো, সেখানেই গল্প করা যাবে।'

ডোরির ঘরটা অ্যাটিকে। অর্থাৎ ছাদের ওপর তিনকোণা ঘর। খুবই ছোট। তবু প্রচুর জিনিসপত্র সাজিয়েছে। সোফা নেই, বিছানা পাতা। সেখানেই আমাকে বসার ইঙ্গিত করে বললো, 'বী কমফর্টেব্‌ল!'

দেরাজ খুলে ডোরি একটা নতুন ব্র্যান্ডির বোতল বার করলো। দুটো গেলাসে ঢেলে বললো, 'মার্গারিট এর মধ্যে তোমার কাছে গিয়েছিল?'

খানিকটা সংকিতভাবে বললাম—হ্যাঁ। মার্গারিট কি ডোরির কাছে কিছু নালিশ করেছে? বলেছে যে ভারতীয়রা কোনো ভদ্রতা জানে না? এতকাল গল্প উপন্যাসে পড়ে এসেছি যে ফরাসী মেয়েদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। তারা যখন-তখন যার-তার সঙ্গে—।

ডোরি বললো, 'মার্গারিট খুব ভালো মেয়ে। বড্ড বেশী ভালো। ও এই পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুন জানে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ডোরি একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল। ডোরির সেইরকম প্রায় বুক খোলা জামা। গা থেকে দামী পারফিউমের সুগন্ধ ভেসে আসছে। আগে লক্ষ করিনি, ওর পা থেকে উরু পর্যন্ত স্কিন-কলার মোজা পরা। ও আমার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, 'তুমি এত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছো কেন? রিল্যাক্স।'

আগের দিন যাকে চুমু খেয়েছি, তাকে আজও নিশ্চয়ই খাওয়া যায়।

কিন্তু তারপর কতটুকু? কোন জায়গায় গিয়ে বলবে—ছিঃ, তোমরা ভারতীয়রা ভদ্রতা জানো না।

দু'তিন গেলাস ব্র্যাণ্ডি খেয়ে অনেকখানি জড়তা কেটে গেল। তখন মনে হলো, দরজা-বন্ধ ঘরে বিছানার ওপর পাশাপাশি বসে ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার একটাই মানে হতে পারে। নারী-পুরুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক। ডোরিই আমার সঙ্গিনী। ডোরিও তো কম সুন্দরী নয়। শুধু তার মুখে একটা উগ্র বুদ্ধির ছাপ। তার স্বাস্থ্য যতটা উপছে উঠেছে, ততটা কমনীয়তা নেই। তাতে কি আসে যায়! মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি ডোরির ঘাড়ে চুমু খেলাম।

ডোরির ডান হাতে সিগারেট ছিল, সেই হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বললো, 'এখানে একটা—আই লাভ ইট বেস্ট হিয়ার।'

সেখানে মুখ রেখে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ডোরি বললো, 'তোমার জ্যাকেটটা খুলে ফেল।'

আর বেশী দূর এগুবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ডোরি টেলিফোন ধরে বললো—ইয়া, আছে... নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, খুব খুসীর সঙ্গে, কাম অন আপ—ফোন ছেড়ে ডোরি বলল, 'এ বাড়ির নিচতলা থেকেই একজন ফোন করছে। ওদের রুজ ফুরিয়ে গেছে—এখন তো দোকান বন্ধ—ওরা ওপরে আসছে, উই'ল হ্যাভ মোর ফান।'

ওরা না আসা পর্যন্ত আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বনে নীরব হয়ে রইলাম। তারপর দরজা খুলে দিতে হলো।

ওরা চারজন, দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। রীতিমতন নেশাচ্ছন্ন। পোষাক দেখলেই মনে হয়, দারুণ জড়াজড়ি চলছিল। ডোরি আরও গেলাস বার করলো। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলো বিছানায়। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। তারপরই এক একটা ছেলে এক একটা মেয়েকে বুকে নিয়ে বসলো। ডোরিও মাথা হেলালো আমার বুকে। এক বোতল ব্র্যাণ্ডি শেষ হয়ে যাবার পর ডোরির দেরাজ থেকে আর একটা বোতল বেরুলো। লজ্জা নামক জিনিসটার কোনো অস্তিত্বই নেই। বরং অপরের চোখের সামনে চুম্বন আলিঙ্গনেই যেন বেশী আনন্দ।

একটা ছেলে হঠাৎ জড়ানো গলায় বললো, স্ট্যাম্প জমাবার মতন ডোরির স্বভাব হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেমিক সংগ্রহ করা। লাস্ট সেমেস্টারে ডোরির একজন ইজিপশিয়ান প্রেমিক ছিল না? তার আগে একজন স্প্যানীশ, একজন জাপানী ফিনল্যাণ্ডেরও একজন ছিল না ডোরি?'

ডোরি হাসতে লাগলো। মেজাজটা একটু খিঁচড়ে গেল আমার। আমি কি একটা ভারতীয় ডাক-টিকিট? কিছুক্ষণ বাদে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমার বাড়ির সামনে দরজার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তাকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেঃ, আপনি আমাকে খুঁজছেন নাকি?'

সে বললো, 'না তো, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি! আপনি?'

আশ্চর্য, লোকটিকে আমি আগে থেকেই চিনি, আমাদেরই বিভাগের একজন, পোল্যান্ড থেকে এসেছে। ওর নামের পদবীতে তিনটে জেড থাকায় প্রথমে আলাপ করতে ভয় পেয়েছিলাম। পুরো নাম ক্রিস্তফ জারজেসকি। ওয়ারশ শহরে অনুবাদকের কাজ করে। এক বছরের জন্য এখানে এসেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখের চামড়া কোঁচকানো, গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, কিন্তু লোকটি মোটেই বৃদ্ধ নয়, বছর ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বয়েস। একই বাড়িতে দু'জনে থাকি, তাও জানি না! ও থাকে ঠিক আমার ঘরের নিচেই।

ক্রিস্তফ বললো, 'ঘরটা বড্ড স্টাফি লাগছে, তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে বড্ড লোনলি লাগে। তোমার লাগে না?'

অভ্যেসবশে ডানদিকে ঘাড় হেলালুম। এরা ঘাড় হেলাবার মানে বোঝে না। আমরা যেমন মাদ্রাজীদের দু'দিকে ঘাড় হেলিয়ে 'না' বলার মানে বুঝতে পারি না।

ক্রিস্তফ বললো, 'এসো। আমার ঘরে এসে একটু বসবে? হোয়াইট রাম আছে, যদি পছন্দ করো—'

মোহময়ী নারীর সান্নিধ্য ছেড়ে এসে এখন এই বৃদ্ধ চেহারার লোকটির সঙ্গে আড্ডা। তবু রাজী হলাম। খানিকটা বাদেই অবশ্য বেশ ভালো লেগে গেল। লোকটি বেশ সীরিয়াস ধরনের, বিশ্বসাহিত্য মোটামুটি পড়া আছে, কথাবার্তায় এলোমেলো ভাব নেই।

এর পর ক্রিস্তফের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ওপরে চলে আসে আমার ঘরে। ও আমারই মতন একাকীত্বের রোগে ভুগছে।

অ্যারিজোনার নেমন্তন্নর পাকা চিঠিটা এখনো আসছে না। রোজই অপেক্ষা করছি। পল ওয়েগনার মাঝে মাঝেই অন্য জায়গায় বক্তৃতা দিতে যায়। আয়ওয়ায় থাকলে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে ওর বাড়িতে। অন্যদের বদলে আমাকেই যে বেশী নেমন্তন্ন করে তার কারণ ওর স্ত্রী মেরি এখনো আমার ওপরে রাগ করেনি বা একদিনও মারতে আসেনি। লোকমুখে শুনেছি, মেরির মাথার গোলমাল আছে, কখন কি কাণ্ড করবে তার ঠিক নেই।

পল বুঝে গেছে, বেশী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আমার স্বভাবে নেই। তাই মাঝে মাঝে জোর করে বড় বড় পার্টিতে নিয়ে যায়। বড় পার্টি আমার বিরক্তিকর লাগে।

ইংরিজি বিভাগের অধ্যক্ষ একটা খুব বড় পার্টি দিচ্ছেন, আমারও নেমন্তন্ন

এসে গেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, যাবো না। ক্রিস্তফ সেদিন সন্ধেবেলা সেজেগুজে এসে বললো, 'কই, তুমি এখনো তৈরি হওনি?'

আমি যাবো না শুনে সে রীতিমতন অবাক। প্রায় আমার অভিভাবকের মতন ধমক দিয়ে বললো, 'কেন যাবে না? এর কোনো মানে হয়? এই পার্টি-গুলোই তো আমেরিকার একটা প্রধান চরিত্র-চিহ্ন। এইসব পার্টিতে লোক-জনের সঙ্গে মিশলে এদের ভালো করে চেনা যায়। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও!'

অগত্যা যেতেই হলো। বিরাট ব্যাপার, অন্তত শ'খানেক নারী-পুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদের মধ্যে বোধহয় সকলেই উপস্থিত। ডোরি এবং মার্গারিটকেও দেখলাম।

অতিথিদের বয়েস একুশ থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি পর্যন্ত। কিন্তু কারুর সামনেই কারুর কোনো আড়ষ্টতা নেই। কেউ এখানে লুকিয়ে মদ বা সিগারেট খায় না। সবাই সবার নাম ধরে ডাকে। এ জিনিসটা তো আমাদের দেশে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। অথচ এখানে কেউ তো কারুর প্রতি অসৌজন্য দেখাচ্ছে না।

তিন-চারখানা ঘরে পার্টিটা ছড়ানো। পার্টির দিন এরা গোটা বাড়িটাই উন্মুক্ত করে দেয়। এক-একটা ঘরে এক-এক রকমের আড্ডা। এখানে কেউ কারুকে এড়িয়ে যায় না। একদম কোনো অচেনা লোকও সামনাসামনি পড়ে গেলে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করে। আমি ডোরি আর মার্গারিট যে ঘরে, সেদিকেই বারবার ঘুরে যাচ্ছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকে নাচ শুরু করলো। আমি দর্শকদের দলে। কিন্তু ক্রিস্তফের খুব উৎসাহ নাচের ব্যাপারে। পুরোনো ইওরোপীয় কায়দায় সে এক-একজন যুবতীর সামনে গিয়ে বাউ করে বলছে—মে আই? মেয়েদের শরীর ছুঁয়ে ও নিঃসঙ্গতা কাটাতে চায়। মুশকিল হচ্ছে এই, বেচারাকে সবাই বুড়ো ভাবছে। মেয়েরা বদলে যাচ্ছে বারবার। তবু ক্রিস্তফ একটুও দমছে না। একবার মার্গারিটকে পেয়ে ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। একে সুন্দরী, তার ওপরে ফরাসী। পোল্যান্ডের লোকেরা সবাই কিছু কিছু ফরাসী জানে। ক্রিস্তফ ওর সঙ্গে গড়গড় করে ফরাসীতে কথা বলা শুরু করলো, তারপর নাচের অনুমতি চাইলো।

একটু বাদে ডোরি এসে বললো, 'এই, তুমি নাচবে না?'

আমি বললাম, 'আমি তো নাচ জানি না!'

—তাতে কি হয়েছে? গোমড়া মুখে বসে আছো কেন? উঠে এসো, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

ডোরি আমার কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলো না। হাত ধরে টেনে তুললো

বললো, 'শক্ত কিছু নয়, শুধু বীটটা মিলিয়ে যাবে, আর দেখবে আমি কি রকম পা ফেলাছি।'

আনাড়ির মতন কয়েকবার ডোরির পা মাড়িয়ে দিলাম। অনেকবার এমন-ভাবে জড়াজড়ি হয়ে গেল, যেন মনে হবে আমি ইচ্ছে করেই করছি। ডোরি তবু আমাকে স্তোক দিয়ে বলতে লাগলো, 'ঠিক আছে, এতেই হবে, এই তো হচ্ছে, তোমার হাতটা আমার কোমরের কাছে দাও—'

দেখলাম, অল্প দূরে ক্রিস্তফ নাচছে মার্গারিটের সঙ্গে। কেন যেন বুকের মধ্যে জ্বালা করতে লাগলো। এর মানে কি? আমিও তো আরেকজনের সঙ্গে নাচছি! তবু আমার হিংসে হবে কেন?

রাত দুটো বাজে, পার্টি তখনও সমান উৎসাহে চলছে। মনে হয় সারা রাত চলবে। আমার পক্ষে আর বেশীক্ষণ থাকা বিপজ্জনক। রন কুলিজ নামে একটি ছেলে আমার হাতের গেলাস খালি দেখলেই বার বার জোর করে হুইস্কি ভরে দিচ্ছে। মাথাটা বেশ টলটলে লাগছে, আর একটুতেই বেশী নেশা হয়ে যাবে। সে ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। বড় পার্টিতে কারুর মাতাল হয়ে পড়া রীতিমতন নিন্দনীয় অপরাধ। আগে আমার ধারণা ছিল আমেরিকান মাত্রই বদ্ধ মাতাল। এখানে এসে দেখছি. যে-কোনো পার্টিতে শতকরা অন্তত ত্রিশজন লোক অ্যালকোহল স্পর্শ করে না। সামাজিকভাবে মদ্যপান এখানকার সভ্যতার একটা অঙ্গ হলেও যে-কোনো মাতালকে সবাই ঘৃণা করে। ছোটখাটো নিজস্ব আসরে যা খুশী চলতে পারে—বড় বড় পার্টিতে একটা সীমারেখা থাকেই।

কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম। একটু বাদে পেছনে পায়ের শব্দ। একটি মেয়ে আসছে। মার্গারিট। ওর জন্য অপেক্ষা করলাম. কাছে আসবার পর বললাম, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?'

মার্গারিট বললো. 'কাল ভোরবেলা আমাকে চার্চে যেতে হবে! কিন্তু তুমি এলে কেন?'

—আমার আর ভালো লাগছিল না।

—আমারও না।

—চলো. তোমাকে পৌঁছে দি।

—আমাকে পৌঁছে দেবে? কিন্তু আমি যে অনেক দূরে যাবো।

—কেন. হস্টেলে ফিরবে না?

—না। আমি অনেকদিন ধরে বব্ বাকল্যান্ডদের বাড়িতে থাকছি। ওরা সল্ট্ লেক সিটিতে গেছেন তো. আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

আমি হেসে উঠে বললাম. 'রাত দুটো পর্যন্ত তুমি বাইরে. তাহলে কীরকম বাড়ি পাহারা দিচ্ছো?'

মার্গারিট বললো, 'পাহারা মানে কি? ওদের একটা কুকুর আছে, সেটাকে খাবার দেওয়া, সকালবেলা একজন লোক বাগানে জল দিতে আসে, তাকে গেট খুলে দেওয়া। এখানে চুরি তো হয় না। আমি প্রায় দেড় বছর আছি তো, কোনোদিন কোনো বাড়িতে চুরির কথা শুনিনি। এরা এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না—ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হাইজ্যাকিং বা কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারেই চোর-ডাকাতরা ব্যস্ত।'

—তবু একদম ফাঁকা বাড়িতে তুমি একলা থাকো, তোমার ভয় করে না?

—না, ভয় কি!

দারুণ নির্জন রাস্তা। বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি প্রায় দু' আড়াই মাইল দূরে। একবার পেঁাছে দেবো বলেছি। দূরত্বের কথা শুনে তো পিছিয়ে আসা যায় না! এই গভীর রাত্রে এতখানি নির্জন রাস্তা এই মেয়েটি একা যাবে ভেবেছিল! চুরি না হলেও নারীহরণের ঘটনা এখানে সুবিদিত। ফাঁকা রাস্তায় একলা মেয়ে দেখলে যখন-তখন কোনো গাড়ি তাকে জোর করে তুলে নেয়। তারপর কিছু দূর গিয়ে মেয়েটাকে একেবারে ছিবড়ে করে কোনো ফাঁকা জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। অধিকাংশ সময়েই মৃত অবস্থায়।

বললাম—চলো—

—তুমি আবার অত দূর থেকে একা ফিরবে?

—তাতে কি হয়েছে?

দুজনে রাস্তার খুব ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দু' একটা অতিকায় ট্রাক এমন উল্কার বেগে ছুটে যায় যে, সামনে কোনো হাতি পড়লেও বোধহয় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

কিছু দূর গিয়ে বললাম, 'তুমি বুঝি প্রতি রবিবার চার্চে যাও!'

মার্গারিট হেসে বললো, 'না! যাওয়া উচিত, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার বাবা মা জানতে পারলে খুব শক্‌ড হবেন। জানো তো আমরা রোমান ক্যাথলিক। আমাদের পরিবার বেশ গোঁড়া, আমার দু' বোন নান্ হয়েছে। আমার ছোটবোন জান্ তো মাত্র গত বছর কনভেণ্টে যোগ দিল। শুধু আমিই বাইরে—আমি ততটা ধার্মিক হতে পারিনি!'

—তোমার কোনো ভাই নেই?

—একজন দাদা ছিল, সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার-এ মারা গেছে। রেজিস্টান্স মুভমেণ্টে ছিল।

—ও।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগলাম। সামনেই আয়ওয়া নদীর ব্রীজ। ছোট নদী, কিন্তু ব্রীজটা বেশ চওড়া। ব্রীজ পেরুলেই জাতীয় হাইওয়ে! আমরা ডান দিকে যাবো। যত দূর দেখা যায় সোজা রাস্তা। দু' পাশে উঁচু

উঁচু গাছ। অবিরল পাতা খসে খসে পড়ছে। বাতাসে রীতিমতন শিরশিরে ভাব। শীত এসে গেল বলে। কোটের তলায় একটা সোয়েটার পরে আসা উচিত ছিল, টাই বিসর্জন দিয়েছি বলে আরও ঠান্ডা লাগছে।

মার্গারিট বললো, 'তুমি কিন্তু বড় কম কথা বলো!'

—তুমিও তো!

—আমি কি বলবো! আমি তো তোমার দেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। যদিও জানতে ইচ্ছে করে—

—আচ্ছা মার্গারিট, তুমি তোমার দেশ ছেড়ে এত দূরে পড়তে এসেছো কেন?

—ব্যাপারটা খুব হাস্যকর, তাই না? আমি ফরাসী ভাষায় পোস্ট ডক্টরেট করছি, তা তো সোরবোর্ণেই করা উচিত ছিল, আমেরিকায় ছোট একটা জায়গায় কেন? কিন্তু সোরবোর্ণে পড়ার মতন টাকা কোথায়? আমার বাবা তো রিটায়ার্ড! আমেরিকায় অনেক স্কলারশীপ পাওয়া যায়, তাছাড়া এরা এ্যাসিস্ট্যান্টশীপও জোগাড় করে দেয়, যেমন আমি গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়াচ্ছি, আরও ছোটখাটো কাজ করি, খরচ উঠে যায়। তাছাড়া এখানকার ফরাসী ডিপার্টমেণ্টটা কিন্তু সত্যি ভালো। প্রফেসার অ্যাসপেলের খুব নাম আছে।

—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথা থেকে? ফরাসীরা তো ইংরিজি ভাষাকে খুবই অবজ্ঞা করে শুনেছি।

—তা করে! বোকার মতন করে। আমি ছেলেবেলায় প্রায়ই লন্ডনের কোনো ইংলিশ ফ্যামিলিতে গিয়ে থাকতাম—তাদের বাচ্চাদের ফরাসী শেখাবার জন্য। আমারও ইংরিজিটা মোটামুটি শেখা হয়ে গেছে। এবার তোমার কথা বলো!

হাসপাতাল ভবনটির পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম কথা বলতে বলতে। এ পর্যন্ত একজনও পথচারীর সন্ধান আমরা পাইনি। এতখানি রাস্তা এই মেয়েটা একা একা হেঁটে আসতো কি করে? কথা বলতে বলতে তবু সময় কাটে এবং পথ ফুরোয়।

বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি পোঁছে গেছি। বাড়িটা খুব বড় না হলেও বাগানটা দেখবার মতন। চারপাশে ফাঁকা। পেছন দিকে অনেকগুলি বড় বড় ঝাউ গাছ। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুব চেনা একটা চাঁদ। চাঁদের ধূসর আলোয় বাড়িটা দারুণ গম্ভীর আর নিঃসঙ্গ মনে হয়। এই বাড়িতে এই সরল মেয়েটা একা থাকবে। এরা সব পারে।

শুভরাত্রি বলবার বদলে বললাম—বঁ নুই!

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ফরাসী জানো?'

হেসে উত্তর দিলাম, 'একটা-আধটা শব্দ কে না জানে?'

—কিন্তু আমি তো বাংলা একটা অক্ষরও জানি না!

—বাংলা তো অনেক অজানা ভাষা!

—মোটেই না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি এনসাইক্লোপিডিয়া দেখেছি। ফরাসী যত লোকের মাতৃভাষা, তার চেয়েও অনেক বেশী লোক বাংলায় কথা বলে। ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় কনিষ্ঠা কন্যার নাম বাংলা। তোমাদের ভাষায় এক কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

—তুমি তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছো দেখছি। তুমি রোম্যাঁ রলাঁর লেখা পড়ো নি?

—কে?

—রোম্যাঁ রলাঁ?

মার্গারিটের মুখে সাকোনতাল শুনে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ওরও অবস্থা অনেকটা তাই। একটু চিন্তা করে বললো, 'ও, তুমি হোম্যাঁ হ্রলাঁর কথা বলছো? কেন, কি হয়েছে?'

—উনি আমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর জীবনী লিখেছেন।

—হ্যাঁ, একটু একটু শুনেছি বটে। তুমি পাগল হয়েছো! হোম্যাঁ হ্রলাঁর লেখা এখন কেউ পড়ে? জাঁ ক্রিস্তফই এখন পড়া যায় না! উনি তো এক পম্পাস পাদ্রি।

রাত অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তবু ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কেউ জেগে নেই এখন।

—তুমি আমাকে একটা অন্তত বাংলা কথা শিখিয়ে দাও না!

—কোন্ কথাটা বলো?

—আমুর। লাভ!

—ওর বাংলা হচ্ছে ভালোবাসা।

মার্গারিট তিন চারবার উচ্চারণ করলো—বা-লো-বা-শ্যা! ওর পাতলা ঠোঁটে ঐ শব্দটা কী মধুর শোনায়! কিন্তু আর নয়। এরকমভাবে রাত কেটে যাবে। বললাম, 'এবার আমি চলি!'

ও বললো, 'তোমাকে এতটা রাস্তা এখন একলা ফিরতে হবে! চলো, আমি তোমাকে আবার একটু এগিয়ে দিয়ে আসি!'

—না, না, না!

—চলো না, একটুখানি!

খানিকটা পথ গিয়েই আমি থেমে পড়ে বলি—ব্যস, আর না। ও বলে, আর একটুখানি, আর একটু। দেখতে দেখতে অনেকটা চলে এলো। তখন আমি দৃঢ়ভাবে বললাম—না, আর কিছুতেই না! তা হলে আমি যাবো না।

মার্গারিট হেসে বললো, 'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!'

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো—অ রেভোয়া!

আমিও ওর হাত চেপে ধরে বললাম—অ রেভোয়া!

তবু এখানেই শেষ হল না। আমার হাতটা ছুঁয়েই মার্গারিট বললো, 'ইস, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা! নিশ্চয়ই তোমার খুব শীত করছে। এতক্ষণ বলোনি কেন?'

—না, না, এমন কিছু না।

—হ্যাঁ, এমন কিছু! তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ওর গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা। সেটা ঝট্ করে খুলে দিয়ে বললো, 'তুমি এটা নিয়ে যাও!'

—না, দরকার নেই, সত্যি বলছি দরকার নেই!

—তুমি বুঝতে পারছো না। এই সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়!

—কিন্তু তুমি যে আবার এতটা পথ ফিরবে, তোমার যদি ঠাণ্ডা লাগে?

—আমার কিছু হবে না।

—তা হতে পারে না। এক কাজ করা যেতে পারে। তোমাকে আমি আবার বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি এটা পরে থাকো, তারপর আমি নিয়ে যাবো।

—তাতে কি লাভ হবে? তোমার আরও বেশীক্ষণ ঠাণ্ডা লাগবে।

মার্গারিট আমার কথা না শুনলেও আমি ওর হাত ধরে টানতে লাগলাম। ওকে দিয়ে আসবোই আবার বাড়ির কাছে।

ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি থামলো। নির্জন রাস্তায় প্রায় শেষরাত্রে আমি একটি তরুণীর হাত ধরে টানছি—এ দৃশ্য রোমাঞ্চকর নিশ্চয়ই! আমি কাঠ হয়ে দাঁড়ালাম। ওদের কাছে সব সময় বন্দুক পিস্তল থাকেই, কী করে আমি আমার সঙ্গিনীকে রক্ষা করবো!

গাড়িটা আসলে পুলিশ পেট্রল। মুখ ঝুঁকিয়ে একজন মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলো, 'এনি ট্রাবল, কিড?'

ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরা কোনো কর্তৃপক্ষকে সহজে সহ্য করে না মনে হলো। মার্গারিট ঝাঁঝালো গলায় বললো, 'নো ট্রাবল! ইউ গো টু হেল!'

মেয়েটার সাহস দেখে আমি চমৎকৃত। মার্কিনী পুলিশ ট্রিগার-হ্যাপি হিসেবে কুখ্যাত। তাদের মুখের ওপর এমন কথা! আমার মুখের ওপর একজন টর্চ ফেললো। ভয়ে আমার ভেতরটা শিরশির করছে। আমি শ্বেতাঙ্গ নই, এটাই যদি আমার প্রধান অপরাধ হয়! কালো লোক হয়ে আমি একটি শ্বেতাঙ্গিনীর হাত ধরে টেনেছি!

এবার মার্গারিটই আমার হাত ধরে ঝটকা টান দিয়ে বললো, 'চলো!'

পুলিশের গাড়িটা তবু কুকুরের মতন আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

আবার মার্গারিটই দাঁড়িয়ে পড়ে বকুনি দিয়ে ওদের বললো, 'হোয়াই ডোন্ট য়ু লীভ আস্ অ্যালোন?'

এবার গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। আমি মিনমিন করে বললাম, 'তোমার তো খুব সাহস!'

মার্গারিট বললো, 'তুমি জানো না, ওদের একদম পাত্তা দিতে নেই। কেন, তুমি কি ওদের ভয় পাও নাকি?'

—আমার একটু একটু ভয় করছিল। কারণ আমি কালো লোক।

—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই!

আবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ির সামনে পোঁছোলাম। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'আগে তুমি গেটের মধ্যে ঢোকো, তারপর আমি যাবো।'

ভেতরে ঢুকে ও গেটে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। আমি ওর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'আজ রাতটা খুব সুন্দর কাটলো।

—আমারও।

ওর হাতটা একবার ছুঁয়েই আমি হাঁটতে লাগলাম পেছন ফিরে। স্কার্ফটা জড়িয়ে নিলাম গলায়। তাতে একটা ক্ষীণ গন্ধ। সেই গন্ধটা যেন আমাকে আদর করছে।

মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলাম। মার্গারিট তখনো দাঁড়িয়ে আছে। সাদা বাড়িটার পটভূমিকায় যেন এক দেবদূতী। হাত তুলে নাড়লো একবার।

আমার মনে এক বিজয়ীর আনন্দ। আমি পেরেছি। আজ আমি ঠিক পেরেছি। এই নির্জন রাস্তায়, এমন নিশুতি রাত্রে এতক্ষণ আমি একজন রূপসী নারীর পাশে ছিলাম, তবু আমি সংযম ভাঙিনি। শুধু একটু হাতের স্পর্শ, আর কিছু না।

গলার স্কার্ফটায় হাত বুলোতে বুলোতে বাকি রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে চলে এলাম। বাড়িতে এসে জুতো খুলেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বিছানাটা কী ঠান্ডা!

॥ ৭ ॥

দু' চারদিনের মধ্যেই অ্যারিজোনার নেমন্তন্নর চিঠিটা এসে গেল। সঙ্গে প্লেন ভাড়া। যেতে হবে অ্যারিজোনার টুসন্ শহরে। বানান অনুযায়ী মনে হয় টাকসন, কিন্তু আসল উচ্চারণ টুসন্। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা আর কিছু অনুবাদ কবিতা পাঠ করতে হবে। বক্তৃতাটা এলেবেলে, বেশী করে কিছু অনুবাদ কবিতা পড়ে দেওয়া যেতে পারে। থাকার ব্যবস্থা ওরাই করবে।

পল ওয়েগনার বললো, 'তুমি যদি প্লেনের বদলে বাসে যাও তাহলে কিছু টাকা বাঁচিয়ে আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসতে পারবে।'

সে তো আমি আগেই ভেবে রেখেছি। অ্যারিজোনা রাজ্যটি আমেরিকার প্রায় দক্ষিণ উপকূলে, আমি আছি মধ্য-দক্ষিণে, সুতরাং অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে আসা যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে আমার বাকি টাকাকড়ি সব তুলে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

সোজা গন্তব্যের দিকে যাওয়ার বদলে একটু এঁকেবেঁকে যাওয়াই আমার স্বভাব। প্রথমেই বাস ধরে চলে গেলাম শিকাগোতে। বাসগুলোর নাম গ্রে হাউন্ড। গর্জন করে পথ চলে। ভিড়ভাট্টার প্রশ্নই নেই, যতগুলো সীট, সেই ক'টা যাত্রী। এবং সীটগুলো ঠিক এরোপ্লেনের মতনই, এমনকি হাতলের সঙ্গে লাগানো অ্যাশট্রে পর্যন্ত। বেশীর ভাগ বড় শহরেই এইসব বাসের স্টেশন আছে মাটির নিচে, প্রায় রেল স্টেশনের মতনই জমজমাট জায়গা।

হিটলার জার্মানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে সারা দেশ জুড়ে অটোবান বা বড় বড় রাস্তা বানিয়েছিলেন। এখন রাস্তা নির্মাণে আমেরিকান-রাও দারুণ মনোযোগী। সারা দেশ জুড়ে বিরাট বিরাট রাস্তা এবং আশ্চর্য মসৃণ। কোনো কোনো রাস্তায় চারটি করে লেন, কোনো গাড়ি সত্তর মাইলের কম গতিতে গেলেই পুলিশে ধরে। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত তিন হাজার মাইলের রাস্তায় গাড়ি একবারও থামবার দরকার নেই, লেভেল ক্রসিং বা চৌরাস্তায় ট্রাফিক আলোতেও দাঁড়াতে হয় না, সেসব জায়গায় রাস্তাটা হয় ছাদে উঠে গেছে অথবা মাটির তলায় ডুব মেরেছে। যে-কোনো ছোটখাটো শহর বা গ্রামেও একই রকম পাকা রাস্তা। অবশ্য অধিকাংশ সেতু পেরুবার সময়েই ট্যাক্স দিতে হয়। সেই ট্যাক্সের টাকায় ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন

সেতু এবং রাস্তা।

এদেশের খাদ্য চলাচল করে প্রধানত ট্রাকে। ট্রাকের জিনিসপত্র অবশ্য তেরপল মোড়া নয়। অনেক ট্রাকের খোলই এয়ার কন্ডিশানড্, অথবা সেখানে ডিপ ফ্রিজ বসানো, যাতে মাছ-মাংসও টাটকা থাকতে পারে। এক-একটা রাজ্য এক-এক রকম খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়েছে। কোথাও হচ্ছে শুধু গম, কোথাও শুধু কমলালেবু, কোথাও পোলট্রি। এইজন্যই ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক-নাম অরেঞ্জ স্টেট, আয়ওয়ার ডাকনাম কর্ন স্টেট। সরকার পরীক্ষা করে খাঁটি বলে নির্দেশ না দিলে কোনো খাদ্যই বাজারে আসতে পারে না—এবং সারা দেশে সব জায়গায় খাদ্যের এক দাম। উত্তরপ্রদেশ থেকে সস্তা দামে শর্ষে কিনে কলকাতার বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার কায়দা এদেশে অচল। এখানে গরিব ও বড়লোকের প্রভেদটা অত্যন্ত প্রকট। গরিব অত্যন্ত গরিব এবং বড়লোকেরা যাচ্ছেতাই রকমের বড়লোক। তবে, আমাদের দেশের সঙ্গে তফাত এই যে, গরিব আর বড়লোকদের দৈনন্দিন খাবারদাবার প্রায় এক। বড়লোকরা শুধু একটা ছবি কেনবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কিংবা নিজস্ব এরোপ্লেনে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে যায়। কিন্তু অত্যন্ত গরিবও দু বেলা মাংস রুটি খেতে পায়। এদেশে কিছু ভিখিরিও আছে, কিন্তু তাদের গায়ে অটুট ওভারকোট এবং তাদের রান্নাঘরে রেফ্রিজারেটর থাকে। পরে এক সময় আমি ঐরকম একজন ভিখিরির ঘরে কয়েকদিন ছিলাম।

আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, বাসে, ট্রেনে কিংবা সিনেমা হলে গরিব আর বড়লোককে পাশাপাশি বসতেই হবে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের ব্যাপার নেই কোথাও। উত্তরের রাজ্যগুলিতে অন্তত, নিগ্রো আর শাদারাও পাশাপাশি বসতে বাধ্য।

আমেরিকানরা নিজেদের দেশে এরকম অনেক বিষয়ে সমতা বজায় রাখলেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসা করার সময়ে তারা একেবারে নৃশংস। অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় গমের উৎপাদন একটু কম হলেই সে বছর তারা সারা পৃথিবীর গমের বাজারে যেমন খুশী দর বাড়ায়। সেনেটর ফুলব্রাইট একবার অভিযোগ করেছিলেন যে, আমেরিকান ওষুধ ব্যবসায়ীরা ভারতে অন্তত চারশো গুণ বেশী দামে ওষুধ বেচে।

দুপুরে শিকাগোতে এসে পৌঁছোলাম। প্রথমদিন এই শহরে এসে-ছিলাম প্রায় ভিখিরির মতন। এবার তার শোধ নিতে হবে। যাকে বলে ডাউন টাউন অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে সাউথ ওয়াবাস এভিনিউতে একটা ভালো হোটেলে উঠলাম, এবং কথায় কথায় ট্যাক্সি। যতদিন পয়সা থাকে নবাবী করা যাক্ না একটু! সব সময় টিপে টিপে পয়সা খরচ করলে একটা মানসিক দৈন্য এসে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পাশে নিউ ইয়র্ক আর অন্য দিকে লস এঞ্জেলিস পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে সব সময়। মাঝখানে শিকাগো বসে আছে এক দৈত্যের মতন। মাফিয়াদের ঘাটি। এককালে বিখ্যাত দস্যু আল কাপন এই শহরটাকে পায়ের তলায় রেখেছিল। আবার নিগ্রো গুন্ডাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রথম রাত্রেই একটি নাইট ক্লাবে আমার চোখের সামনে কয়েকজন নিগ্রোর মধ্যে ছুরি মারামারি হয়ে গেল। শিকাগোর জ্যাজ্ বাজনা বিখ্যাত, তাই শুনতে গিয়েছিলাম, শেষকালে দৌড়ে পালাবার পথ পাই না!

দু'তিন দিন থাকার পরেই শিকাগোর বৈচিত্র্য অনেক কমে যায়। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো খুব একটা আলাদা নয়। পার্ক স্ট্রিটকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাঁচ গুণ করতে পারলেই শিকাগোর রাস্তা হয়ে যায়। এত বড় সুন্দর পার্ক অবশ্য কলকাতায় নেই, কিন্তু দিল্লিতে আছে। লেক মিসিগান দেখলে সমুদ্রের কথাই মনে পড়ে। অন্যান্য চাকচিক্যও দু' দিনে পুরোনো হয়ে যায়, যেমন পঞ্চাশতলা মোটর গ্যারেজ কিংবা দোকানের ম্যাজিক ডোর—দরজার সামনে দাঁড়ালেই আপনাআপনি দরজা খুলে যাওয়া, কিংবা আকাশের গাছে আলোয় বিজ্ঞাপন। চুম্বক ছাড়া আর কোনো বস্তুরই দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণ থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত থাকে মানুষ। এবং শহুরে মানুষ কোথাও খুব আলাদা নয়।

শিকাগোর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ন্যাশনাল মিউজিয়াম। সেটা গোটা একদিন ধরে ঘুরে দেখে পরদিনই কেটে পড়লুম সেখান থেকে।

আবার যে-কোনো জায়গায় বাস ধরলেই হয়। তবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম অ্যালাবামা, জর্জিয়া, মিসিসিপির রাস্তার দিকে কিছুতেই যাবো না। কালো লোক বলে যদি কেউ মাথায় চাঁটি মারে কিংবা কোনো দোকানে ঢুকতে না দেয়, তবে সেই দণ্ডেই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে! প্রায়ই কাগজে এরকম ঘটনা পড়ি।

বাস ধরে চলে এলুম ক্যানসাস সিটি। তারপর উইচিটা। তারপর আরক্যান-সস। এক একদিন এক এক জায়গায়। এও যেন সাঁওতাল পরগণায় ঘুরে বেড়াবার মতনই। তফাত এই যে, সব জায়গাতেই একই রকম আরামদায়ক হোটেল। ঘুরতে ঘুরতে আলবুকার্কে শহরে এসেই একটু অন্যরকম লাগলো। এখানে রাস্তাঘাটে অনেক রেড ইন্ডিয়ান দেখা যায়। পালকের মুকুট পরা নয় অবশ্য, সাধারণ প্যান্ট-সার্ট পড়াই, তবু দেখলে চেনা যায়। শুনলাম কাছেই কোথাও ওদের এনক্লেভ আছে, অর্থাৎ ওদের জন্য আলাদা করা নির্দিষ্ট জায়গা—হলিউডের ফিল্ম কোম্পানিগুলো ছবি তুলতে এলে ওরা মুখে লাল রং মেখে মাথায় পালকের মুকুট পরে নেয়।

ইতিমধ্যে বাসে বা হোটেলে আমি অন্যদের কাছে পরিচয় দেবার সময়

নিজেকে ইণ্ডিয়ান বলা ছেড়ে দিয়েছি। কেউ বোঝে না। এখানে স্পষ্ট করে বলতে হয়, কামিং ফ্রম ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা। শুধু ইণ্ডিয়ান বললে এখন আমেরিকার আদিবাসীদেরই বোঝায়। রেড শব্দটা উঠে গেছে। উচ্চারণটা অবশ্য একটু আলাদা, ইণ্ডিয়ান নয়, ইনজান্! কী অবস্থা সে বেচারিদের! ভূতপূর্ব জমিদার যদি বাড়ির দারোয়ান হয় সেই রকম। কলকাতা সমেত তিনখানা গ্রাম সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা বেচে দিয়েছিল মাত্র তেরোশো টাকায়। সেইরকম নিউ ইয়র্ক নামের উপদ্বীপটিও ইণ্ডিয়ানরা সাহেবদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে।

কাছেই মেক্সিকো। আমেরিকার একটি রাজ্যের নামও নিউ মেক্সিকো। এখানে স্প্যানীশ ভাষাও বেশ চলে। রেড ইণ্ডিয়ান আর স্প্যানীশদের মিশ্রণে এখানে একটি সংকর জাতি তৈরি হয়েছে। তাদের চেহারা অনেকটা আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের মতন। রাস্তা-ঘাটে অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে গড়-গড় করে কী যেন বলতে শুরু করে দেয়, আমি এক বর্ণ বুঝি না। আমাকে বোকার মতন চুপ করে থাকতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করে—স্প্যানীওল স্প্যানীওল? ওরা আমাকে জাতভাই ভেবেছে। আমি ঘাড় নেড়ে বলি—নো, ইংলিশ। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ওনলি ইংলিশ। কেউ কেউ তখন বেশ রাগতভাবে তাকায়। ছাপরা জেলার কোনো লোক যেন কলকাতায় এসে বাবু সেজে জাত-ভাইদের চিনতে পারছে না!

মেক্সিকো ঘুরে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার ভিসা নেই। ভিসা অফিসে গিয়ে শুনলাম, ওদিকে যেতে পারি বটে, কিন্তু এদিকে আর ফিরতে পারবো না। ওখান থেকেই বাড়ি যেতে হবে। সুতরাং যাওয়া হল না। নোগালিস নামে একটা শহরের অর্ধেকটা আমেরিকায়, অর্ধেকটা মেক্সিকোতে। সেই শহরেই একদিন ঘুরে বেড়িয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। এ যেন শুধু ফুন্ট-শুলিং গিয়ে ভুটান দেখে আসা।

নোগালিস শহর থেকে আর বাস নয়, প্লেনে চাপলাম। কারণ টুসন্-এ আসল নিমন্ত্রণ-কর্তারা আমাকে বিমান বন্দর থেকে নিতে আসছে। এইভাবে তাদের চোখে ধুলো দেওয়া। আমি যেখান থেকেই যাই না কেন, প্লেন থেকে নামলেই তো হলো।

বিমান বন্দরে দেখলাম জাঁদরেল চেহারার এক মেমের পাশে আমার এক স্কুলের বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। সে যে এই দেশে আছে তাই জানতাম না। অন্তত পনেরো বছর দেখাই হয়নি। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের মুখ কেউ ভোলে না।

বাংলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি রে সুবোধ! তুই কি করে এলি?'

সুবোধ এক গাল হেসে বলল, 'আমি এসেছি তোকে চিনিয়ে দেবার জন্য।

স্টুপিড, আমাকে চিঠি দিসনি কেন আসবার আগে?'

—কি করে জানবো, তুই এখানে আছিস?

—আমি কি করে জানলুম জানিস? এখানকার কাগজে তোর নাম ছাপা হয়েছে।

—তাহলে খুব ফেমাস হয়ে গেছি বল?

—না রে গাধা। ইউনিভার্সিটিতে বাইরে থেকে যে-ই আসে, সভা-সমিতির কলমে তারই নাম ছাপা হয়।

খুব জমে গেল টুসন্-এ। শুধু পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই নয়। এখানকার লোকেরা খুব চট করে আপন করে নিতে জানে। নানান জায়গায় নেমন্তন্ন, পরের গাড়িতে খুব ঘোরাঘুরি। বক্তৃতার ব্যাপারটা দু' লাইনে সেরে এবং কাঁপা কাঁপা গলায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করে আমার দায়িত্বও চুকিয়ে দিলাম।

এখানকার কবি-লেখকদের প্রধান আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেমন্তন্ন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা পাঠ বা বক্তৃতা দিতে ডেকে তাদের পাঁচশো থেকে হাজার ডলার দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন জ্যান্ত লেখকদের গ্রাহ্যই করে না, মৃতদেরই শুধু কদর। এখানে ঠিক তার উল্টো। এখানে বেঁচে থাকাই প্রতিদিন একটা উৎসবের মতন, মৃত্যুকে এরা মনে রাখে না। মৃত্যু আসে এবং চলে যায়। তবু বাকি লোকদের কাছে জীবন প্রতিদিন আরও বেশী ফুল-ফল-পল্লবময়।

ড্যানি ডেনহাম নামে একটা ছেলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। তার বউয়ের নাম বারবারা। দু'জনেরই এমন চমৎকার স্বাস্থ্য যে মনে হয় বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এরা যুগ্মভাবে প্রথম হবার যোগ্য। কেন যে কেঁচোর মতন মাস্‌লওয়ালা কিছু লোক ঐ সব প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর জেতে কে জানে!

ড্যানি ওদের বাড়িতে এক সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন খেতে গেলে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, রাজস্থানের মরুভূমিতে কত ফুট খুঁড়লে জল পাওয়া যায় বলতে পারো?'

এ আবার কি বিদঘুটে প্রশ্ন? রাজস্থানের মরুভূমির কথা জানলোই বা কি করে? সাধারণভাবে দেখেছি, আমেরিকানরা ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা এখনো সাউথ আফ্রিকার রাজধানীর নাম মুখস্থ করে—আর এখানে এরা অনেকে জানেই না, বেঙ্গল পৃথিবীর কোথায়। এরা বেশী খবর রাখে নিজের দেশের। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অনেকখানি অজ্ঞ বলেই মনে করে, ওদের দেশটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা। আসবার পথে মিসিসিপি নদী দেখতে গিয়েছিলাম যখন, খুবই সুন্দর সেই নদীর দৃশ্য, তবু সেখানে এক প্রৌঢ়ের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল,

এত বড় নদী আগে কখনো দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র দেখেছি। সেই প্রৌঢ় পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্রের নাম তো দূরে থাক, সম্ভবত চীনের হোয়াং হো বা ইয়াংসি কিয়াং-এরও নাম শোনেনি।

ড্যানির কথায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করায় বারবারা বললো, 'জানো না, ওর খুব মরুভূমি সম্পর্কে কৌতূহল। পৃথিবীর সব মরুভূমির খবর রাখে। ও মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে যায় কিনা!'

—তাই নাকি?

ড্যানি বললো, 'কালই তো আবার যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

ওয়াইল্ড ওয়েস্টে স্বর্ণশিকারীদের সম্পর্কে অনেক গল্প পড়েছি, ছবিও দেখেছি। সেরকম এখনো চলে নাকি? এই এক নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাড়া যায় না। রাজী হয়ে গেলাম।

ড্যানির একটা স্টেশান ওয়াগন আছে, নানারকম রং করা। রৌদ্র-ঝলমল সকাল, তার মধ্যে দিয়ে গাড়িটা একটা অচেনা প্রাণীর মতন ছুটে যায়। প্রচুর হ্যাম সসেজ আর পাঁউরুটি নেওয়া হয়েছে, আর কয়েক ডজন বীয়ার। বারবারা যা পোশাক পরেছে, তাকে পোশাক না বলে পোশাকের অছিলা বলা যায়। ড্যানি পরেছে একটা শর্টজ আর খালি গা। বারবারারও খালি গা-ই প্রায়, শুধু ফিতের মতন একটা ব্রা-তে প্রগল্‌ভ স্তন দুটিকে আটকে রাখার চেষ্টা। আমি আল-বুকার্কেতে ব্লু জিন্‌স আর গেঞ্জি কিনেছিলাম, তাই পরে এসেছি। গাড়ির সামনের সীটেই আমরা তিনজন। প্রথম প্রথম বারবারার শরীরের সঙ্গে ছোঁয়া লাগায়, যাকে বলে আমার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠছিল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছিল। বারবারার দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না। খানিকটা বাদে কিন্তু সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আকাশের নিচে, খোলা মাঠের মধ্যে আমরা প্রকৃতির সন্তান, পোশাকের বাহুল্যের প্রয়োজনটা কি!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মরুভূমিতে। এ মরুভূমি অবশ্য অন্য-রকম, নিছক বালির সমুদ্র নয়। অসমতল বিরাট প্রান্তর, কোথাও বালি, কোথাও পাথুরে মাটি। কিছু দূর দূর অন্তর প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটা বিরাট ক্যাকটাস, দু'তলা তিনতলা বাড়ির মতন উঁচু। স্প্যানীশ ভাষায় এগুলোর নাম সাউআরো, আশী-নব্বই বছর করে বয়েস এক-একটার, কোনো কোনোটা নাকি দেড়শো দু'শো বছর পর্যন্তও বাঁচে। অদ্ভুত দৃশ্য। আরও ছোটখাটো নানান জাতের ক্যাকটাসও ছড়িয়ে আছে, ফুল ফুটেছে কোনোটাতে। একটা আগেকার দিনের পাউডার পাফের মতন ফুল দেখিয়ে বারবারা জিজ্ঞেস করলো, 'এটার নাম কি জানো? একে বলে শাশুড়ির মাথা!'

ড্যানি গাড়ি থামিয়েছে একটা টিলার কাছে। রোদ এখন বেশ কড়া। একটা

দানব ক্যাকটাসের ছায়ায় বসে আমরা বীয়ার সহযোগে কিঞ্চিৎ ছোট হাজ্‌রি সেরে নিলাম। ড্যানি বললো, 'সাবধানে চারদিকটা দেখে বসবে কিন্তু, এ জায়গাটায় র‍্যাট্‌ল স্নেকের আড্ডা!'

প্রথম কিছুক্ষণ আমরা ড্যানির সঙ্গে সোনার সন্ধানে যোগ দিলাম। পাশাপাশি ছড়িয়ে শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটা। এখানকার বালি ছাঁকলে নাকি সত্যি কিছু কিছু সোনা পাওয়া যায়, কিন্তু খরচা পোষায় না। ড্যানি তাতে উৎসাহী নয়। সে চায় তাল তাল সোনা। কিংবা সোনার ঢ্যালা। কেউ কেউ নাকি দু'একবার পেয়েছেও। এখানকার পাথরগুলোর রংও বিচিত্র, সুতরাং একেবারে সোনালি রঙের পাথর থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

এক সময় বারবারা আর আমি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। ড্যানির ক্লান্তি নেই।

বীয়ারে চুমুক দিয়ে বারবারা বললো, 'ড্যানিটা কী রকম পাগল জানো? এই বিরাট মরুভূমিটাকে ও ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুঁজে দেখবে ঠিক করেছে। গত সপ্তাহে ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, আজ আবার সেইখান থেকে শুরু করেছে। আমি জানি, ও কোনোদিনই পাবে না। পাবার কোনো দরকারও নেই।'

—কেন?

—আমরা তো স্বর্ণলোভী নই। এই খোঁজাটাই আসল, এটাই দারুণ এক্সাইটিং। পাওয়াটা নয়। জীবনে সব সময়েই কিছু খুঁজে বেড়ানো দরকার। পেয়ে গেলে খোঁজাটা থেমে যায়—সেটাই বিরক্তিকর!

এসব দার্শনিক কথাবার্তা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। সেই স্বর্ণকেশী যুবতীর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ড্যানি তো একেই পেয়েছে, আর সোনা পাওয়ার দরকারটাই বা কি! এ বছর বারবারা চাকরি করছে, ড্যানি করছে পড়াশুনো আর এইরকম অ্যাডভেঞ্চার। আগামী বছর সে চাকরি করলে, বারবারা আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। চমৎকার জীবন।

আর একটা কথা ভেবেও আশ্চর্য হচ্ছিলাম। এরা কত সহজে আপন করে নিতে পারে। মাত্র ত' একদিনের পরিচয়! এই এখন দুপুর রৌদ্রে এক অজানা মরুভূমির মধ্যে বসে এক প্রায় অচেনা মেয়ের পাশে বসে বসে বীয়ার খাবো—এটা কি কয়েক মাস আগে স্বপ্নে ভেবেছিলাম? এখনো মাঝে মাঝে সবটাই স্বপ্ন মনে হয়। সত্যি আমি এখানে বসে আছি? হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করি। তারপরই কাছাকাছি কোথাও কিরকির কিরকির শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠি। র‍্যাট্‌ল স্নেক নয় তো! ড্যানি অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে।

এরা এতই উদ্যমী যে এই মরুভূমির মধ্যেও একটা ছোট মিউজিয়াম খুলে রেখেছে। একলা একটি বাড়ি। তাতে রয়েছে এই মরুভূমির ম্যাপ এবং এখানে কী কী জিনিস ও পশু-পাখি-প্রাণী পাওয়া যায় তার নমুনা। সেখানে র‍্যাট্‌ল

স্নেকও যেমন আছে, তেমনি আছে কয়েক টুকরো সোনালি পাথর—ড্যানির মতন ছেলেদের উৎসাহ টিকিয়ে রাখার জন্য।

দুপুরে আমাদের এক ফাঁকে মিউজিয়ামটা দেখিয়ে দিয়ে ড্যানি আবার সোনা খুঁজতে লাগলো। তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এলো। সূর্যাস্তে দিগন্ত সোনার রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এখন গোটা মরুভূমিটাকেই সুবর্ণময় বলে মনে হয়। তার মধ্যে থেকে ড্যানি রিক্ত হাতে ফিরে এলো, মুখে কিন্তু হাসি, বললো—আবার সামনের রবিবার আসবো।

ঘোর সন্ধের পর ফিরে, তারপর আর এক অধ্যাপকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আমার ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে পোয়েট্রি সেণ্টারের অতিথি ভবনে। গোটা বাড়িটাতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সকালবেলা একটি মেয়ে এসে শুধু বিছানার চাদর পাল্টে দিয়ে যায়—তারপর তো সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটছে।

নির্জন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়। একটা বই নিয়ে শুয়েছিলাম। কখন তন্দ্রা এসে গেছে, তার মধ্যে যেন অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কোথায় টেলিফোন বাজছে। আমার এ ঘরে টেলিফোন নেই। আরও দু'খানা ঘর পার হয়ে সামনের অফিস ঘরে টেলিফোন। শব্দটা সেখান থেকেই। উঠতে ইচ্ছে করে না। নিশ্চয়ই আমার জন্য নয়। শব্দটা কিছুতেই থামছে না। উঠতেই হলো।

—হ্যালো?

—তোমাকে কি বিরক্ত করলাম? ঘুমোচ্ছিলে?

—না, মানে, কে আপনি? কাকে চাইছেন?

—আমি মার্গারিট। আমি কিন্তু তোমার গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পেরেছি।

—মার্গারিট? ভাবতেই পারিনি।

—শোনো, এত রাত্রে টেলিফোন করলাম কেন জানো তো? রাত বারোটার পর লং ডিসটেন্স কল-এর চার্জ সস্তা হয় কিনা।

—ও, না না, বেশী রাত হয়নি, ওখানে কি কিছু হয়েছে?

—না, কিছু হয়নি। এমনিই ইচ্ছে হলো। তুমি ভালো আছো তো? ওদিকের লোকগুলো কেমন, তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই! তুমি কেমন আছো?

—তুমি এতদিন দেরি করছো কেন? কবে ফিরবে?

মাত্র তিন মিনিট সময়। বিস্ময় কাটতে না কাটতেই সময় ফুরিয়ে যায়। রিসিভারটা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। মনের মধ্যে তিরতির করছে একটা ভালো-লাগার অনুভূতি। আমার জন্য একজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে! আমি কবে ফিরবো? এটা নিশ্চয়ই নিছক ভদ্রতার প্রশ্ন নয়।

তা হলে নিশ্চয়ই এত রাত্রে ফোন করতো না। তা ছাড়া মেয়েটাও যে অন্যরকম।

পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম লস অ্যাঞ্জেলিসের দিকে। ঘোরাঘুরি করতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসে হলিউড-ফলিউড না দেখে গেলে লোকে বলবে কি!

লস অ্যাঞ্জেলিসের লোকরা বলে, তাদের শহরটা নিউ ইয়র্কের চেয়েও বড়। আসলে এটা একটা শহর নয়, পাশাপাশি কয়েকটা শহর জোড়া দেওয়া। আমার মনের অবস্থার জন্যই হোক বা যে-কারণেই হোক, শহরটা আমার ভালো লাগলো না। শুধুই যেন টাকা-পয়সার গন্ধ। এখানকার সিনেমা হলগুলোও অদ্ভুত। হলিউডের গা-ঘেঁষা বলেই বোধহয় এখানকার লোকেরা সহজে সিনেমা দেখতে চায় না। অনেক সিনেমা হলেই এক টিকিটে দুটো পুরো ছবি দেখানো হয় এবং আগে ও পরে বেশ কিছু জ্যান্ত মেয়ের ধেই ধেই করে ন্যাংটো নাচ। দেখতে দেখতে হাই ওঠে।

কন্ডাকটেড ট্যুরে হলিউডের স্টুডিও-ফুডিও দেখে নিলাম একবেলায়। বিকেলে নিজেই বাস ধরে চলে গেলাম সমুদ্রের ধারে। রাস্তা ছেড়ে, বাড়ির আড়ালগুলি পার হতেই চোখে ভেসে উঠলো সমুদ্র। সমুদ্র আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু চোখের সামনে প্রশান্ত মহাসাগর। তাতেই কীরকম রোমাঞ্চ হয়। এই হচ্ছে সমুদ্রের রাজা। সোজা যেদিকে তাকিয়ে আছি সেদিকেই কোথাও এক জায়গায় এর সঙ্গে মিশেছে ভারত মহাসাগর। তারই এক টুকরোর নাম বঙ্গোপসাগর। তার কোলের কাছে কলকাতা! ঝাঁপ দেবো এই সাগরে? সাঁতার তো মন্দ জানি না।

পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে ঢেউ। মনে পড়লো, কাল রাত্রে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, কবে ফিরবে। আর তো কোথাও কেউ আমার জন্য প্রতীক্ষা করে নেই!

এবার সানফ্রানসিসকো। এই শহরটা সত্যিই সুন্দর। প্রকৃতিকে আমরা যে অর্থে সুন্দর বলি, সেই অর্থে কোনো বড় শহরই সুন্দর নয়। বোধহয় সানফ্রানসিসকোই এর ব্যতিক্রম। এখানে প্রকৃতি আর মানুষে গড়া সভ্যতা চমৎকারভাবে মিলেমিশে আছে। শহরটা ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে সমুদ্র। কী গাঢ় নীল জল!

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে পল ওয়েগনার আগে থেকেই চিঠি লিখে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। হোটেল থেকে কিছুতেই সেই অধ্যাপককে টেলিফোনে ধরতে পারছি না। এটাই আমার এখানে একমাত্র কাজ। তা ছাড়া বিশ্ববিখ্যাত বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় একবার চোখে দেখা। এখানকার ছাত্র আন্দোলন সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

কলাম্বাস এভিনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বইয়ের দোকান চোখে

পড়লো। সিটি লাইটস্ বুক শপ। নামটা চেনা। এদের প্রকাশিত কিছু বই পড়েছি, চিঠিপত্রেও একবার যোগাযোগ হয়েছিল।

ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ ফেলিংগেটি আছেন কি?'

মেয়েটি আমার দিকে আপাদমস্তক একবার দেখে শুকনো গলায় বললো, 'তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়া দেখা করা শক্ত।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে আসছিলাম, মেয়েটি আবার ডাকলো। সেই মুহূর্তে বাইরের দরজা দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক ঢুকলো, মাথার চুলগুলো কাঁচা-পাকা। গায়ে চেকচেক লাল জামা। মেয়েটি বললো, 'ইনিই তো লরেন্স ফেলিংগেটি।'

আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

ফেলিংগেটি আমার কাঁধে এক থাবড়া মেরে বললো, 'সত্যি? সেই অত দূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছো?'

সে আমাকে কাছাকাছি একটা এসপ্রেশো কফির দোকানে টেনে নিয়ে গেল। অনেক গল্প। মাঝে মাঝে অন্য ছেলেমেয়েরা আসছে, আলাপ হচ্ছে, কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ থাকছে। ফেলিংগেটি দারুণ আড্ডাবাজ, কিছুতেই আমাকে উঠতে দেবে না।

একটু বাদে দাড়িওয়ালা নোংরা জামা-প্যাণ্ট পরা একজন লোক এসে টেবলে বসলো। ফেলিংগেটি তাকে গ্রাহ্যই করলো না। তখন সে নিজেই বললো, 'ল্যারি, এক কাপ কফি খাওয়াও!'

আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমার নাম জো স্মিথ। হু ইউ?'

ফেলিংগেটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে জো স্মিথ ফিসফিস করে বললো—ক্যাঁ ইয়া স্পেয়ার মি আ বব?

ফেলিংগেটি মুখ ফিরিয়ে এক ধমক দিয়ে বললো, 'এই জো, এই ফাকিং ব্যাস্টার্ড, তোর লজ্জা করে না! তুই একজন গরিব ভারতীয়ের কাছ থেকে ভিক্ষে চাইছিস?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি গরিব ভারতীয় বলেই এদেশের লোকদের ভিক্ষে দিতে আমার খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া তোমাদের দেশের টাকাই তো খরচ করছি।'

এক ডলার বাড়িয়ে দিতেই জো স্মিথ নির্লজ্জের মতন সেটা নিয়ে সুট করে কেটে পড়লো।

এরা ঠিক না-খেতে পাওয়া ভিখিরি নয়। এদের বলে জাঙ্কি। নেশার জন্য যে-কোনো উপায়ে টাকার জোগাড় করে।

তবে, খানিকটা আগে, রাস্তায় একজন লোক কানের কাছে এসে ফিসফিস

করে বলেছিল—আ কোয়ার্টার, আ কোয়ার্টার (সিকি) প্লিজ। আর তাকে খাঁটি ভিখিরিই মনে হয়েছিল। এসব দেখলে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এখন রাস্তায় কোনো একটা লোককে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে দেখলেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সানফ্রানসিসকোর চীনেরা বেশ বিত্তশালী। এখানকার মতন এমন বর্ণাঢ্য চীনে-পাড়া এখন খোদ চীনেও আছে কিনা সন্দেহ। বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর নৌকো-টৌকোতে পার হয়ে কবে এরা এখানে এসেছিল কে জানে। কিংবা এসে- ছিল শ্লেভ লেবার হিসেবে। এখন এদের বিশাল বিশাল দোকান, বাড়িঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল। যে-কোনো দোকানে ঢুকলে এদের নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যদি কোনোদিন এরা সানফ্রানসিসকোর খানিকটা অংশ আলাদা চীনা-স্তান হিসেবে দাবি করে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিকেলের দিকে টেলিফোনে অধ্যাপককে পাওয়া গেল। উনি বললেন— আরে কি মুশকিল। আমিও তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তুমি এক কাজ করো, বাস ধরে এক্ষুনি চলে এসো; ফেরার সময় আমি তোমায় পৌঁছে দেবো। এখন আমার যেতে যেতে দেরি হয়ে যাবে, সন্ধের সময় গোল্ডেন গেট ব্রীজের অপূর্ব দৃশ্য তুমি মিস করো না—

সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেতু। পৃথিবীর উনিশতম আশ্চর্য। এত আলোয় সাজানো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া সোনার জন্য বিখ্যাত ছিল এক সময়। এখনো সূর্যের আলো ও বিদ্যুতে চতুর্দিকে শুধু স্বর্ণসজ্জা। হঠাৎ মনে হয়, এই সবকিছুই একদিন প্রচণ্ড আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

॥ ৮ ॥

অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এলাম আয়ওয়ায়। লাস ভেগাশে নেমেও জুয়া খেলার লোভ সংবরণ করেছি। নেভাদার পাহাড় ডিঙিয়ে, বিরাট লবণ হ্রদের পাশ দিয়ে, নেব্রাস্কা হয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলাম। আর বেড়াতে ভালো লাগছে না। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। এখন বাড়ি মানে অবশ্য মিড ওয়েস্টে, ছোট্ট শহরে রাস্তার পাশে একটা দোতলার ঘর।

ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমে আছে। গেটের পাশে বেশ কয়েকদিনের খবরের কাগজ। সব কুড়িয়ে এনে ঘরের চাবি খুললাম। তারপর প্রথমেই টেলিফোন করলাম মার্গারিটকে—আমি এসে গেছি। তোমার কি এখন ক্লাশ আছে? কখন দেখা হচ্ছে?

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে মার্গারিট এসে গেল। ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু।

দারুণ চমকে গেলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'এ কি?'

দু' হাত ছড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার্গারিট বললো, 'এসো, তুমি এবার আমাকে একটা চুমু খাও।'

—কিন্তু এরকম তো কথা ছিল না?

—সেদিন আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কবিতা পড়ার পর তুমি আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলে, তোমার মুখখানা তখন বাচ্চা ছেলের মতন দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন একটা আবদার, তবু আমি রাজী হইনি! আমি অন্যায় করেছি সেদিন!

—না, না, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়!

—জানো, এ নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। একথাও মনে হয়েছে, তুমি হয়তো ভাবতে পারো, যেহেতু তুমি ইওরোপীয়ান বা হোয়াইট নও, সেইজন্যই আমি রাজী হইনি! ইস্, ছি ছি ছি, যদি সে কথা ভেবে থাকো......।

—না, ভাবিনি সেরকম। সত্যি! বিশ্বাস করো।

—আমি চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করার সময় মনে মনে জিজ্ঞাসা করতাম, ভগবান, আমাকে বলে দাও কোনটা ঠিক! হঠাৎ একজনকে চুমু খাওয়া পাপ, না একজনের মনে দুঃখ দেওয়া বেশী পাপ? আমি কয়েকদিন আগে উত্তর পেয়ে গেছি।

—কি?

—এই যে তোমাকে চুমু খেলাম? এবার তুমি আমাকে খাও! এই শোনো, আমি কিন্তু ঠিক মতন চুমু খেতে জানি না। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে তো?

মার্গারিটকে স্পর্শ করতে আমার ভয় করলো। যেন ও একটা দুর্লভ, দারুণ মূল্যবান জিনিস, আমার স্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা গাঢ় লাল রঙের সোয়েটার পরে আছে। মুখেও যেন সেই রঙের আভা। হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—। কোনোদিন কোনো নারী আমাকে এরকম ভাবে আহ্বান করেনি। অনেক প্রত্যাখ্যান পেয়েছি, আহ্বান পাইনি। এগিয়ে গিয়ে খুব নরম ভাবে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম।

মার্গারিট সত্যিই ঠোঁট দুটো শুধু একটু ফাঁক করে রইলো আনাড়ির মতন। নাকে নাক লেগে যায়। চুমু খাওয়ার সময় যে নারী-পুরুষের নাক দুটো অদৃশ্য হয়ে যায়, তা ও জানে না।

চুম্বন সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারিট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটফটিয়ে উঠলো। বললো, 'আমার একটুও সময় নেই। একটুও সময় নেই এখন! শুধু এলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে। আমার ক্লাস আছে। কিছু বইপত্র এনেছো? কি কি জিনিস কিনলে? আচ্ছা, সব পরে দেখবো। চলি, আমার চারটে পর্যন্ত ক্লাস, বিকেলে আবার আসবার চেষ্টা করবো।'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। কাঠের সিঁড়িতে ওর হাই হিল জুতোর এমন খটখট শব্দ হচ্ছিল যে আমার ভয় হলো, মেয়েটা পড়ে না যায়!

দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সকাল এগারোটা বাজে। এখন অনেক কাজ। ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। রান্নার কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ফ্রিজ খালি, দোকান থেকে কিছু কিনে না আনলে চলবে না। পল ওয়েগনারকে আমার ফিরে আসার খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করলো না। বিছানাটা খুলে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নিজের ঠোঁটটায় হাত রাখলাম। এই সকালবেলা একটা মেয়ে ঝড়ের মতন এসে আমাকে চুমু খেয়ে গেল। একি সত্যি? না কি এটাও স্বপ্ন?

শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। অল্প অল্প শীতের আমেজের মতন একটা ভালো-লাগার চাদর যেন আমার গায়ে জড়িয়ে আছে। একটু বাদে অনুভব করলাম, সত্যি শীত করছে। উঠে গিয়ে যে সেণ্ট্রাল হিটিং-এর সুইচটা চালিয়ে দেবো, তাও ইচ্ছে করলো না। গুটিসুটি মেরে শুয়ে সিগারেট ধরালাম। অ্যাশট্রেটা টেবলের ওপর, উঠে সেটা আনতেও আলস্য লাগলো। নিজের ঘরের মেঝেতে যদি ছাই ফেলি, তাতে আমায় কে কি বলবে?

আমার যা খুসি করতে পারি।

ঘণ্টাখানেক বাদে দরজায় আবার খটখট শব্দ হলো। এবার তো উঠতেই হবে। কে হতে পারে? শার্ট-প্যাণ্ট পরেই আছি। সুতরাং দরজা খোলার কোনো অসুবিধে নেই।

খুলেই দেখলাম মার্গারিট। মুখটা লাজুক লাজুক। একটু যেন অপরাধীর মত ভাব।

—একি, তুমি ক্লাস করলে না?

—আমি কি আবার এসে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম!

—না, না, এসো এসো।

ভেতরে এসে ও বললো, 'ক্লাসে গিয়ে দেখলাম, আমার আজ পড়াতে একটুও ভালো লাগছে না। কিছুতেই মন বসছে না। অন্যমনস্কভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো উচিত নয়।'

আমি একটু হাসলাম।

মার্গারিট কৃত্রিম রাগের সঙ্গে আমার বুকে একটা আঙুলের টোকা মেরে বললো, 'তুমিই তো আমার আজ সব কিছু এলোমেলো করে দিলে!'

—আমারও আজ কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো যেন মার্গারিটের শরীরটা একটু একটু দুলছে। ঘোরের মতন অবস্থা। আমিও যেন পৃথিবীর আর সব কিছু ভুলে গেছি। একটা আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর একবার?'

ও নিজেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ওর ঠোঁটে, কানের নিচে, গলায়, বুকে অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিলাম। যেন আমি অমৃত পান করছি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হবে না।

দুজনেই কখন এসে বিছানায় বসেছি। ও আমার গালে দু' হাত রেখে চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, 'শোনো, একটা কথা শোনো—'

—কি?

—তোমার ভালো লাগছে?

একথা তো মেয়েরা জিজ্ঞেস করে না, ছেলেরাই জানতে চায়। এ মেয়েটা কোনো কিছুই জানে না।

—তোমার?

মার্গারিট রুদ্ধশ্বাসভাবে বললো, 'আমার এত অসম্ভব ভালো লাগছে যে আমি যেন সহ্য করতে পারছি না। এ আমার কি হলো বলো তো? এতদিন কিছু জানতামই না—

—মার্গারিট, তোমাকে আগে কেউ চুমু খায়নি?

—আমার বাবা, মা।

—না, সেরকম নয়। এতদিন এদেশে আছো—

মার্গারিট অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বললো, 'এই আমেরিকান ছেলেগুলো? এঃ!'

—কেন, এদের কারুকে তোমার ভালো লাগেনি? অনেক ভালো ভালো ছেলে আছে।

—সে কথা বলছি না। তা থাকতে পারে। কিন্তু এরা শারীরিক ব্যাপারটা এত জল-ভাত করে ফেলেছে, আমার মোটেই পছন্দ হয় না!

—তবু এতদিনে কেউ তোমাকে চুমু খেতে চায়নি?

—না। চায়নি। অনেকে জোর করে খেতে এসেছে—জোর মানে, দে টেক ইট ফর গ্রাণ্টেড—কোনো পার্টিতে কারুর সঙ্গে নাচলে বা একটু বেশীক্ষণ কারুর সঙ্গে কথা বললেই অমনি ঠোঁটটা এগিয়ে আনে—যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ জিনিস। আমি সব সময় নিজের ঠোঁটে হাত চাপা দিয়েছি বা মুখ সরিয়ে নিয়েছি। কেউ আগে থেকে অনুমতি চায় না। তুমিই সেদিন প্রথম চাইলে, তোমার মুখখানা অবিকল একটা বাচ্চা ছেলের মতন দেখাচ্ছিল—সেইজন্যই মনে হলো, এর মধ্যে কোনো পাপ থাকতে পারে না—সত্যি তুমি খুব বাচ্চা ছেলের মতন এমন সরলভাবে বলেছিলে...।

মার্গারিট বারবারা আমার মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন বলছে, সেটা আমার তেমন পছন্দ হলো না। আসলে ওর চোখমুখই যে একেবারে শিশুর মতন সেটাই ও জানে না।

ও আবার বললো, 'তোমার ম্যাকগ্রেগরকে মনে আছে? ও একদিন আমাকে গাড়ির মধ্যে এমন বিশ্রীভাবে জোর করে আদর করার চেষ্টা করেছিল, আমি খুব চটে গিয়েছিলাম! আমাকে আমেরিকান মেয়েদের মতন চীপ মনে করেছিল!'

—তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছো! গল্প-উপন্যাসে যা পড়েছি, আমারও ধারণা ছিল, ফরাসী মেয়েরা এইসব ব্যাপারে খুব ফ্রি হয়, তাদের কোনো ইনহিবিশান থাকে না।

মার্গারিট দারুণভাবে আপত্তি করে বললো, 'না, না, না, না—একদম মিথ্যে কথা। মোটেই সত্যি না। ফরাসী মেয়েরা কক্ষনো ওরকম হয় না, পারীর মেয়েরা হতে পারে! প্যারিসিয়ান আর ফ্রেঞ্চ পিপল্-এ অনেক তফাত। পারী হচ্ছে সারা ফ্রান্সের তুলনায় সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম জায়গা।'

আমি বললাম, 'তা নয়। আসলে তুমিই অন্য ফরাসী মেয়েদের তুলনায় একদম আলাদা। তোমাদের বাড়ি প্যারিসে নয়? তাহলে কোথায়?'

আমি তো গ্রামের মেয়ে। আমাদের গ্রামের নাম লুদাঁ। এই নাম শুনে অবশ্য কেউ চিনবে না। কাছাকাছি শহরটার নাম পোয়াতিয়ে। আমাদের গ্রাম

থেকে আমি আর আমার বন্ধু এলেনই শুধু পারীতে পড়তে এসেছিলাম।

—পারীতে পড়াশুনো করেও তুমি প্যারিসিয়ান হওনি!

—কোনো জায়গার খারাপ জিনিসটাই কি নিতে হবে?

—মার্গারিট, তুমি কি আজ থেকে খারাপ হয়ে গেলে?

মার্গারিট ব্যাকুলভাবে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, 'না, না, না, না! এই দেখো। তুমি দেখো, আমার গা কাঁপছে। আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। কোনো খারাপ কাজ করলে কখনো এত ভালো লাগে? আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, কোনো খারাপ কাজে আমার কখনো আনন্দ হয় না।'

—কোন্টা খারাপ, কোন্টা ভালো, তাই নিয়ে তো অনেক তর্ক আছে।

—আই ডোনট্ কেয়ার! আমি নিজের মনে মনে ঠিক বুঝতে পারি। কোনো কিছু হলে, আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি। চার্চে প্রেয়ার করার সময়েও প্রশ্ন করি মনে মনে। আমি ঠিক উত্তর পেয়ে যাই।

আমি মার্গারিটের হাতের আঙুলে চুমু খেলাম। তারপর ওকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। তারপর ওর সোয়েটারের বোতামে হাত রাখতেই ও খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি আরো কিছু করবো?'

—কেন, তোমার কি আপত্তি আছে?

—আমি ঠিক জানি না। মনের ভেতর থেকে একটা দারুণ ইচ্ছে বারবার যেন বলতে চাইছে, তুমি আমাকে আরও আদর করো, আরও অনেক আদর করো—কিন্তু আমি কি একদিনে এতখানি সইতে পারবো?

—হ্যাঁ পারবে। ঠিক পারবে।

—না, না, শোনো, আমরা বরং আর একটু অপেক্ষা করি। আজ না হয় কাল, না হয় আরও পরে—আমি ঠিক বুঝতে পারবো, আমি নিজেই তোমাকে বলবো...ব্যাপারটা যেন শুধু লোভ না হয়ে যায়, যেন সব সময় খাঁটি আনন্দ থাকে। এখন আমার নিজেরই খুব লোভ হচ্ছে, এটা যখন লোভহীন আনন্দ হয়ে যাবে, ঝর্ণার জলের মতন নির্মল, আমি একবার আলজাস্লোরেনে এরকম একটা ঝর্ণা দেখেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, আঃ, জলটা এত সুন্দর পরিষ্কার, পৃথিবীতে কি আর কোনো কিছু এতো পরিষ্কার হতে পারে? তুমি আমার ওপর রাগ করলে?

—না, না।

—প্লীজ রাগ করো না। আমার ওপর কক্ষনো রাগ করো না। তুমি আমার পাশে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি কিন্তু আজ ক্লাসে যাবো না, কোথাও যাবো না, এইখানে শুয়ে থাকবো। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আর কারুকে দরজাও খুলে দেবে না। কেউ এলেও আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে থাকবো—ভাববে ভেতরে কেউ নেই।

শুয়ে রইলাম পাশাপাশি। কোনো মেয়ের পাশে যে এরকমভাবে শুয়ে থাকা যায়, আমি জানতাম না আগে। বিশেষত এরকম একটি যৌবনবতী অপরূপ সুন্দরীর পাশে। তবু আমার কষ্ট হলো না। একটা শান্ত মাধুর্যের স্বাদ পেলাম জীবনে প্রথম।

মার্গারিট আমার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'তোমার গায়ের রংটা কী রকম জানো? পাকা জলপাইয়ের মতন। দেখলেই মনে হয়, তোমার চামড়া অনেক রোদ্দুর শুষেছে, তাই একটা সতেজ টাটকা ভাব আছে। আমাদের রং সাদা, ফ্যাকাশে—তার মানে বেশী রোদ্দুর খাইনি! আমি এত রোদ্দুর ভালোবাসি!'

আমি বললাম, 'তোমার পাশে আমাকে কি রকম দেখাচ্ছে জানো? আমার লজ্জা করছে। আমার গায়ের রং কালো হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার চেহারাটা কি বিচ্ছিরি! থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, গোদা গোদা হাত-পা—তোমার পাশে আমি যেন ঠিক বিউটি অ্যান্ড দা বীস্ট-এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ।'

আমার গায়ে একটা চাপড় মেরে বললো, 'ঠিকই তো। তুমি একটা বীস্ট! এত জোর চুমু খেয়েছো যে আমার ঠোঁট ফুলে গেছে। আর একটা চুমু দাও।'

একটু বাদে বললো, 'আচ্ছা, কিস্-এর বাংলা কি? দেখো সেদিন লাভ-এর বাংলা শিখিয়েছিলে, আমার মনে আছে।'

—কিস্ হচ্ছে চুমু।

—সু-মু?

—না, চুমু। চ অ্যাজ ইন চক্।

—আই?

—আই হচ্ছে আমি।

—দ্যাখো, এবার আমি একটা পুরো বাংলা সেনটেন্স বলতে পারবো। দেখবে?

জলে ডুব দেবার আগে কিংবা দৌড় শুরু করার আগে লোকে যেমন দম নেয়, সেইরকম জোর নিশ্বাস টেনে মার্গারিট বললো—আম্মি সুমু বালোবাশ্যা।

আমার হাসি আর থামতেই চায় না। দেশ ছাড়ার পর এমন প্রাণ খুলে একদিনও হাসিনি। এমন মিষ্টি বাংলাও শুনিনি এর মধ্যে।

ও বারবার বলতে লাগলো, 'কি ভুল হয়েছে? ভুল বলেছি? কেন ভুল হলো?'

আমার মুখে আসল বাংলাটা শুনে বললো, 'তোমাদের ভাষা কিন্তু খুব শক্ত।'

—তোমাদের ফরাসীর চেয়ে অনেক সোজা! বাবাঃ, ফরাসীতে তো ভার্ব

মুখস্থ করতে করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়!

—মোটেই না। ফরাসী খুব সহজ। তুমি শিখবে?

—ইউনিভার্সিটিতে তোমার ক্লাসে ভর্তি হবো?

—তা হলে খুব মজা হয় কিন্তু। আমার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু সবাই বাচ্চা নয়। পি-এইচ ডি করতে গেলে এখানে ফ্রেঞ্চের একটা কোর্স নিতে হয়। তুমি বেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে থাকবে, আমি পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকিয়ে উইংক করবো! তুমি উইংক করতে জানো?

—কেন জানবো না। এই তো!

—না, না, তোমাব ঠিক হলো না! একদম বাচ্চাদের মতন করলে, তোমার দু' চোখই বুজে আসছে। এই দ্যাখো, ফ্রেঞ্চরা সবচেয়ে ভালো উইংক করতে পারে—

—তাহলে ফরাসী ভাষা শেখবার আগে উইংকিংটাই আগে ভালো করে শেখা যাক্!

—নিশ্চয়ই। ফ্রেঞ্চ ভালো করে শিখতে গেলে তোমাকে ঠিক মতন কাঁধ শ্রাগ করা শিখতে হবে। ওনিয়ন সুপ খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, আড়াই শো রকমের চীজ-এর মধ্যে যে-কোনো একটা মুখে দিয়েই তোমাকে বলতে হবে, সেটা কতদিনের পুরোনো, হুইস্কির বদলে কোনিয়াক ভালো লাগাতে হবে।

কিছুক্ষণ আমরা চোখ টেপাটিপির খেলা খেললাম। তারপর আমি বললাম, 'ইস, ইংরেজদের বদলে যদি ফরাসীরা ভারতবর্ষটা দখল করতে পারতো, তা হলে এসব আমরা কবেই শিখে যেতাম!'

—তুমি এর আগে কোনো ফরাসী মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছো?

—অনেকদিন আগে, তখন আমি খুবই ছোট, পাঁচ-ছ' বছর বয়েস, চন্দননগর বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা চকোলেটের দোকানে একজন ফরাসী মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার নাম কি? তিনি আদর করে আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন, মনে আছে।

—কোন্ জায়গাটা বললে?

—চন্দননগর!

মার্গারিট লাফিয়ে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বললো, 'ও, স্যানডোরনাগার। কারিক্কল, মাহে, স্যানডোরনাগার। ভূগোলে পড়েছি, ইণ্ডিয়াতে আমাদের কলোনি ছিল! আমাদের ধারণা ছিল জায়গাগুলো বোধহয় পৃথিবীর উল্টো পিঠে। কলকাতা থেকে কতদূরে?

—খুব কাছেই। কলোনি ছিল বলে খুব গর্ব, তাই না?

—মোটেই না। কোনো মানুষের উপরেই অন্য মানুষের রুল করা উচিত নয়। গডই তো সবাইকে রুল করছেন।

—মার্গারিট, আমি কিন্তু ঈশ্বর মানি না।

—তাতে ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি নেই। তোমার মানাটা আমিই মেনে দেবো এখন। তোমাকে কিছু করতে হবে না। থাক গে, শোনো না, আমার বাবার না একবার স্যানডোরনাগারে যাবার কথা ছিল চাকরি নিয়ে, আমিও তখন খুব ছোট। আমার মা কিছুতেই রাজী হলেন না, তাই যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, যদি আমরা যেতাম সেখানে—তা হলে সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারতো। আমরা এক সঙ্গে খেলা করতাম, কি মজা হতো না!

আমি হেসে বললাম, 'না। সেরকম কিছুই হতো না! তুমি থাকতে কলোনিয়াল অফিসারের মেয়ে, পাক্কা মেমসাহেব—আর আমি সামান্য একটা নেটিভের ছেলে। আমাদের দেখাশুনো হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না।'

মার্গারিট ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'কি জানি! কিন্তু হলে বেশ ভালো হতো!'

—তোমার সঙ্গে এখানে যে আমার দেখা হয়েছে, সেটাই এখনো ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথায় আমি ছিলাম, কোথায় তুমি ছিলে!

—সত্যি, এটা কিন্তু সত্যি—আমিও তো ছিলাম লুদাঁ বলে একটা গ্রামে, কি করে এসে পড়েছি আমেরিকার একটি গ্রামে, সেখানে বন্ধুত্ব হলো পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকারী এক ভারতীয়ের সঙ্গে।

—পাঁচ হাজার বছর-টছর বলো না। আমাকে কি অতটা বুড়ো মনে হয়?

মার্গারিট হেসে উঠলো খুব। বললো, 'না, ঠিক অতটা না হলেও তোমার বয়েস অন্তত দু'তিন হাজার বছর মনেই হয়!'

দুপুর দুটো বাজে। আমাদের হঠাৎ খেয়াল হলো, আমরা কেউই কিছু খাবার খাইনি। মার্গারিট বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি কিছু খাবে না? আমার খিদে পেয়েছে কিন্তু। চলো, আমরা দু'জনে মিলে কিছু রান্না করি!'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'রান্না করার মতন কিছুই নেই যে। এখানে ছিলাম না তো, ফ্রিজ খালি। চলো কোনো দোকানে গিয়ে খেয়ে আসি।'

—দূর, ইচ্ছে করছে না!

—তা হলে তুমি বসো। আমি চট্ করে কিছু কিনে আনি।

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত কিছু চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক্। খাবার-টাবারের ঝামেলা করে দরকার নেই। তুমি এক ডজন বীয়ার আর কিছু চীজ আর হ্যাম নিয়ে এসো। আমরা সেগুলো নিয়ে কবিতা পড়তে বসবো!'

আমি তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা পরে নিলাম। সেটা হিমের মতন ঠান্ডা! মার্গারিট বললো, 'একি, তুমি সেন্ট্রাল হিটিং চালু করোনি! উ হু হু হু.

আমার খুব শীত করছে! আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো!'

আমার বুকে মাথা রেখে মার্গারিট লাজুক লাজুক মুখ করে বললো:, 'তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো? সেদিন তোমার বাড়িতে আমি আমার বইখানা ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম!

—সত্যি? কি ভাগ্য আমার।

—সেদিন তো ডোরি আর লিন্ডার সঙ্গে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাই বলা হলো না! শকুন্তলার গল্পটা শোনার বিশেষ ইচ্ছে ছিল আমার। তাই ভাবলাম, আবার আসবার একটা কিছু উপলক্ষ তো চাই—কতদিন ধরে গল্পটা জানার আগ্রহ ছিল—তুমি এত সুন্দর করে বললে!'

—তুমি আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আরও অনেক বেশী সুন্দর করে পড়েছিলে! আপোলিনেয়ারকে ধন্যবাদ, উনি শকুন্তলার বিষয়ে না লিখলে তোমার সঙ্গে বোধহয় আমার আলাপই হতো না।

—এসো, আজ আমরা শকুন্তলা আর আপোলিনেয়ারের স্বাস্থ্যপান করবো।

॥ ৯ ॥

কয়েকদিন হলো বেশ জমিয়ে শীত পড়েছে। কিন্তু বরফ পড়া এখনো শুরু হয়নি। সবাই বলছে, ঠিক ক্রিসমাসের দিন তুষারপাত শুরু হবে। এখনো পনেরো ষোলো দিন বাকি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার ছিল বিকেলবেলা। রাশিয়া থেকে একজন কবি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁর কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা। ক্রুশ্চেফের সফরের পর এই দুটি দেশের মধ্যে খুব শুভেচ্ছা সফর বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। পল ওয়েগনারও কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো যাবেন।

কবিটি কিন্তু নিতান্তই বাচ্চা। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী বয়েস নয়। যদিও দোভাষী আছে, তবু সে নিজেই মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলার চেষ্টা করে। বেশ জমে গেল সেমিনারটা। ছেলেটি চমৎকার হাসিখুশী! মাঝে মাঝে তার রসিকতায় শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠেছে। সুন্দর আনন্দময় পরিবেশ। দেখে কে বলবে যে, এই দুটি জাত পরস্পরের জন্মশত্রু!

আমি বসেছিলাম ক্রিস্তফের পাশে। ওর খুব সর্দি হয়েছে বলে গোড়াতেই আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল—তুমি দূরে গিয়ে বসো, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে!

ও বেচারা সারাক্ষণ মুখ বেজার করে বসেছিল। কিছুই ঠিক মতন উপভোগ করতে পারছে না। অনবরত নাকে রুমাল চাপতে হচ্ছে।

সেমিনারের শেষে সাইডার পান। এখানে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে মধ্যে কোনো উৎসবে মদ্য পরিবেশন করা হয় না। সেটুকু সংস্কার রয়ে গেছে। শুধু দেওয়া হয় আপেলের রস অথবা কোকাকোলা। এখানে এরা বলে যে কোনো বিদেশী যদি সকাল এগারোটার আগেই এক বোতল কোকাকোলা খাবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমেরিকান সংস্কৃতি তাকে একেবারে গ্রাস করেছে।

সাইডার পার্টিতে আমি আর না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'পাশে বিরাট বাগান। পেছনে নদী। খেলার মাঠ নেই। সমস্ত রকম খেলার জন্য নদীর ওপাশে স্টেডিয়াম আছে। অনেকে দুঃখ করে, আয়ওয়াতে মাত্র একটা স্টেডিয়াম, অন্যান্য বেশীর ভাগ শহরেই স্টেডিয়াম তিন-চারটে।

বাগানের মধ্য দিয়ে শর্ট কাট করলে আমার বাড়িটা কাছে হয়। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের প্রধান ভবন অর্থাৎ ক্যাপিটলের দক্ষিণ দিকে বলে আমার রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটল। বাগানের নানা জায়গায় অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্রছাত্রী শুয়ে আছে। প্রত্যেকটি যুগলই দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। ওদের দিকে তাকাতে নেই, তাকালেও খুব একটা দোষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইড বইতেই লেখা আছে যে, বিদেশী ছাত্র বা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পক্ষেও ডেটিং-এর সময় নেকিং-পেটিং-কিসিং পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশী দূরে না যাওয়াই ভালো! আমার শুধু আশ্চর্য লাগে ওদের চুম্বনের তীব্রতা দেখে। এতই দীর্ঘস্থায়ী যে মনে হয় পরস্পর পরস্পরের জীবনীশক্তি যেন একেবারে শুষে নিতে চাইছে। এতে কি ভালো লাগে? আর একটা ব্যাপার, এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর আছে, এবং যে-কোনো ছেলে বা মেয়ের ঘরে অন্য যে-কেউ আসতে পারে, কোনো রকম বিধিনিষেধ নেই, তবু, বাইরে, বাগানের মধ্যে এরা এই প্রদর্শনীটি করবেই। দেখতে অবশ্য আমার মোটেই খারাপ লাগে না।

মন্থরভাবে হাঁটছিলাম, হঠাৎ মনে হলো আমার গায়ে কি যেন পড়ছে। মুখ তুলে সামনে তাকালাম। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলাম না। চতুর্দিকে বাতাসে যেন অসংখ্য পেঁজা তুলোর টুকরো ভাসছে। মাটিতে সেগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই কি তুষারপাত? আমার হৃৎপিন্ড লাফিয়ে উঠলো। অন্য কেউ কিছু গ্রাহ্যই করছে না যদিও, কিন্তু আমার জীবনে এই তো প্রথম তুষার দেখা। গায়ের ওপর পড়ছে, তাতে আমি ভিজে যাচ্ছি না তো! হয় ওভারকোটের হাতায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অথবা খসে পড়ছে ফুলের পাপড়ির মতন! আজ বছরের প্রথম তুষারপাত, আমার কাছে কেন যেন মনে হলো একটা বিরাট সংবাদ। মার্গারিটকে জানাতে হবে তো, ও কি দেখেছে?

বাড়ির দিকে দৌড় লাগালাম। পৌঁছোবার আগেই যদি থেমে যায়? চাবি দিয়ে দরজা খুলেই দেখলাম, মার্গারিট টেবিলের সামনে বসে বিনম্র আলোয় একটা বই পড়ছে। ঘরটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সমস্ত পর্দাগুলো ফেলা।

ওর হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে এসে বললাম, ‘কি করছো? বাইরেটা দেখোনি!’

পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। তুষারপাত এখন আরও অনেক ঘন হয়ে এসেছে। বাইরে শুধু এখন পেঁজা তুলো। মার্গারিট শিশুর মতন হাততালি দিয়ে উঠে বললো, ‘ইস, কী সুন্দর, কী সুন্দর! আমি বোকার মতন এতক্ষণ দেখিনি!’

মার্গারিটও যে আমার মতন খুশী হয়েছে, এতে আমি খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। কোনো কিছু ভালো লাগলেই প্রিয়জনকে তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে যদি তাতে উৎসাহ না পায়, তাহলেই মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়!

মার্গারিট আমার বুকে মাথা রেখেছে, আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বাইরের বরফ পড়া দেখতে লাগলাম। ও বললো, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছো? যখন স্নো পড়ে, তখন চারদিকটা কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে যায়? সবাই যেন একে সম্মান জানাচ্ছে। প্রত্যেক বছর প্রথম তুষারপাতের দিনটা আমার দারুণ এক্সাইটিং লাগে।'

—তোমাদের ফ্রান্সে এরকম পড়ে?

—নিশ্চয়ই! আরও অনেক ভালো করে পড়ে!

—দুষ্টুমণি। তোমাদের ফ্রান্সে তো সব কিছুই বেশী ভালো।

মার্গারিট ওর নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইলো, আমি ওকে ঠাট্টা করছি কিনা! আমি চুমু দিয়ে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলাম। ও আমার ওভারকোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো—দাঁ ল' ভিঈ পারক সলিতেয়ার এ প্লাসে। দিঈ ফরম জ' তু আ ল' অর পাসে......

—এর মানে?

—ইস্, হঠাৎ এটা বললাম কেন? এটা দুঃখের কবিতা—মৃতদের কবিতা।

—তবু মানেটা বুঝিয়ে দাও।

—প্রাচীন নির্জন পার্ক, তুষারে ঠান্ডা, এর মধ্যে দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র পার হয়ে গেল।

—জানি, এটা ভেরলেইনের কবিতা, অনুবাদ পড়েছিলাম।

মার্গারিট গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় নাচতে নাচতে বললে—ম' দিউ! কি চমৎকার! কেউ যদি কোনো কবিতার লাইন শুনে চিনতে পারে, তা হলে কি যে ভালো লাগে, কি বলবো!

—শোনো, শোনো, এটা বাই চান্স আমি একটা অনুবাদে পড়েছিলাম তাই, আমারই এক বন্ধু অনুবাদ করেছে।

—যাই বলো না কেন, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার মতন এমন কবিতা-পাগল আমি আগে কখনো দেখিনি!

—তোমার একটা পুরস্কার পাওয়া দরকার। কি পুরস্কার নেবে বলো তো?

—আমি তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে চাই।

—সে পরে হবে, দাঁড়াও! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

মার্গারিট জানে, আমি ঘরে ফিরেই শু-মোজা খুলে চটি পরি। তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

—আরে, আরে, কি করছো কি?

—আমি আজ তোমার জুতো খুলে দেবো।

—না, না, না।

কোনো বাধাই মানলো না। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ মেয়েটা কি শরৎচন্দ্র পড়েছে নাকি? শরৎচন্দ্রের নায়িকারা ছাড়া কোন্ মেয়ে কবে পুরুষের জুতো খুলে দিয়েছে? কিংবা সব দেশের মেয়েরাই এক! এই ক' মাসে একটা জিনিস বুঝেছি, ভাষার তফাত, কয়েকটি আচার-ব্যবহারের তফাত বাদ দিলে সব দেশের মানুষের মধ্যেই অনেক সাধারণ মিল আছে। হাসি কিংবা কান্নার মুহূর্তগুলো সকলেরই এক।

বাড়িওয়ালাকে লুকিয়ে আমার দরজার সামনের কার্পেটের চাবিটা আমি মার্গারিটকে দিয়ে দিয়েছি দেড় মাস আগেই। বাড়িওয়ালা বুড়ো অবশ্য একদিন দেখে ফেলেছে, মার্গারিট যে প্রায় সারাক্ষণই আমার ঘরে থাকে, সে কথাও জানে। কিন্তু এদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ এত তীব্র যে অন্যদের ঘরোয়া ব্যাপারে কিছুতেই মাথা গলায় না, কোনো মন্তব্যও করে না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বাড়িটা বেশ কাছে বলেই মার্গারিট এখানে যখন-তখন আসে। মাঝখানে এক ঘণ্টা ক্লাস না থাকলে এখানে এসে বিশ্রাম নিতে পারে। এখানে স্নান করে। ওর কয়েক প্রস্থ জামাকাপড়ও এখানে রাখা আছে। ওর টাইপ রাইটারটা আমাকে ধার দিয়েছে, দুজনে মিলে সুবিধেমতন ব্যবহার করি! আমার জন্য প্রায়ই ও গাদা গাদা বই কিনে আনে। সেগুলো এক সংগে পড়া হয়। রাসিন নাকি শেক্সপীয়ারের চেয়েও বড় নাট্যকার। সেটা প্রমাণ করবার জন্য যে কত বই পড়ে শোনালো!

রান্নাবান্নার ভারও ও নিয়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম আমার রান্নার রকমসকম দেখে ও হেসে কুটি কুটি হতো! আমি ভেবেছিলাম, খিচুড়ি রান্নাই সহজতম উপায়। এখানে প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায়। তবে নতুন করে নামগুলো শিখতে হয়। ওয়ার্ডবুকের বিদ্যেতে বিশেষ সুবিধে হয় না। বেগুনের ইংরেজি জানতাম ব্রিঞ্জাল, এখানে তাকে বলে এগ্ প্ল্যান্ট। কী অদ্ভুত নাম বাবা! এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আরো আছে। এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম ফুটবল, সেটা ওরা হাত দিয়ে খেলে। হেলমেট ও বর্ম পরা কিছু লোকের মাঠের মধ্যে হাতে বল নিয়ে মারামারি করাই খেলা। ওটার নাম হ্যান্ড বল হওয়া উচিত ছিল, তবু ওরা ফুটবল বলবেই। আর আমাদের দেশের পা দিয়ে বল খেলাটার নাম নাকি সক্কার! ঠিক একই রকমভাবে এরা কমলালেবুকে বলে ট্যাঞ্জারিন, কিন্তু মৌসুম্বি লেবুকে বলে অরেঞ্জ। দই-এর ইংরেজি কার্ড নয়, ইয়োগার্ট। বিস্কুটকে বলবে কুকি। কত রকম তরকারির আগে নামই শুনিনি, যেমন আর্টিচোক, সেলারি ইত্যাদি। তবে, পটোলের মতন চেহারার কোনো কিছু এখনো দেখিনি! দেশ থেকে একটা বেঙ্গলি-টু-ইংলিশ ডিকশনারি আনিয়েছিলাম, তাতে আবার বেশীর ভাগ আমেরিকান শব্দই নেই। সাধে কি আর একবার ইংরেজরা বলেছিল, আমেরিকান ফিলমগুলো ইংরেজিতে ডাব্ করা উচিত।

যাই হোক, ডিকশনারি দেখেই আমি টারামারিক অর্থাৎ হলুদ গুঁড়ো আর লেনটিল অর্থাৎ মুসুরির ডাল কিনেছিলাম। মুসুরির ডাল দেখে মার্গারিট বলেছিল—লেনটিল? লেনটিল সুপ তো ইটালিয়ানরা খুব খায়। তোমরাও খাও নাকি! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। কী বলবো! বাঙালীকে মুসুর ডাল খাওয়াতে শেখাবে ইটালিয়ানরা! লেনটিল সুপ আর ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল কি এক হলো?

খিচুড়ি রান্না করা খুব সোজা। প্রথমে বড় সসপ্যানটাতে খানিকটা ডাল ঢেলে খুব করে ফোটালাম। তারপর তাতে ঢেলে দিলাম খানিকটা চাল। এবার ইনস্ট্যান্ট রাইস নয়, ক্যানসাসে উৎপন্ন বাসমতী চালের মতন সরু কাঁচা চাল। রং করার জন্য দিলাম হলুদ। খিচুড়িতে আলু থাকে বলে দিলাম চাকা চাকা করে কেটে কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ। মাঝে মাঝে হাতায় করে তুলে দেখছি সব ঠিক সেদ্ধ হয়েছে কিনা! ধৈর্য থাকে না। আরও কিছু যেন করা দরকার। কয়েকটা কাঁচা বীন ফেলে দিলাম ওর মধ্যে। সেদ্ধ করা ফ্রোজেন চিংড়ি ছিল। তাও দিলাম। তারপর কয়েক চামচ নুন। দু' একটা কাঁচালঙ্কা। আর কি দেওয়া যায়! হ্যাঁ, টম্যাটো তো আছে। তা তো সব জিনিসেই চলে! এবার দিলাম কয়েকটা বড় সাইজের টম্যাটো। মাসরুম অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতাও খুব সুস্বাদু, এটাই বা বাদ যাবে কেন?

যখন রান্না শেষ হলো, তখন দেখলাম, যতটা খিচুড়ি হয়েছে তাতে পনেরো-কুড়ি জনের রীতিমতন ভুরিভোজন চলতে পারে। ঘন থকথকে একটা জিনিস। যতটা পারলাম খেলাম। অমৃতের মতন স্বাদ। নিজের রান্না বলে বলছি না, ও রকম খিচুড়ি পৃথিবীতে একবারই রান্না হয়েছে। বাকিটা ঢুকিয়ে রাখলাম ফ্রিজে।

পরদিন দেখি, সে জিনিসটা জমে শক্ত হয়ে আছে। ছুরি দিয়ে তা থেকে এক টুকরো কেটে নিলাম। বড় এক স্লাইস কেকের মতন। পরে সেটার সঙ্গে জল মিশিয়ে আবার ফুটিয়ে নেবো ভেবে অন্য একটা সস্প্যানে রেখেছি, এমন সময় মার্গারিট এসে উপস্থিত। দেখে বললো, 'এটা কি? কোনো কেক?'

—না, এটার নাম খিচুড়ি।

—কে' স ক্য সে?

—তুমি বুঝবে না। খিচুড়ি খুব চমৎকার জিনিস। তোমাদের পিৎজা'র থেকে অনেক ভালো।

—দেন আই মাস্ট টেইস্ট ইট।

সেই ঠাণ্ডা শক্ত খিচুড়ি খানিকটা মুখে দিল। মুখ দেখে মনে হলো, ও যেন সক্রেটিসের হেমলক পানের দৃশ্য অভিনয় করছে। থু থু করে ফেলে দিয়ে বললো, 'এ রকম বিচ্ছিরি, বাজে, বীভৎস, জঘন্য, নুন পোড়া, অদ্ভুত গন্ধওয়ালা

জিনিস আমি আগে কখনো খাইনি। কোনো মানুষ খেতে পারে না। তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও?'

ফ্রিজ খুলে বড় সসপ্যানটা দেখে ও আবার চমকে উঠলো। চোখ গোলগোল করে বললো, 'তুমি কি তোমার এই সাধের 'কেচুড়ি'—এখানে যতদিন থাকবে কিংবা সারা জীবন ধরে খেতে চাও?'

আমি হাসতে লাগলাম। সেই সুযোগে মার্গারিট সমস্ত জিনিসটাই ফেলে দিল ট্র্যাস ক্যানে। আমি হা হা করে বাধা দিতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে।

মার্গারিট বললো, 'তুমি মায়োনেজ কি করে বানাতে হয় জানো? কিংবা দুধ দিয়ে ওমলেট? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি।'

এখানে চিকেন সবচেয়ে সস্তা। তারপর হ্যাম, সবচেয়ে দাম বীফের। পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না, ভেড়ার মাংসে একটা বিটকেল গন্ধ, মাছ বিশেষ কেউ খায় না, আমাদের মাছের মতন স্বাদও নয়। আমি পর পর কয়েকবার মুর্গী কিনে আনলেই মার্গারিট বলতো—তুমি কি গরীব হয়ে গেছো নাকি? তুমি কি টাকা জমিয়ে টেকসাসে তেলের খনি কিনবে?

টাকা-পয়সা সম্পর্কে মেয়েটি অদ্ভুত নির্মোহ। আমরা এক সঙ্গে রান্নাবাড়ি শুরু করার পর থেকেই মার্গারিট ওর পুরো মাসের মাইনে আমার টেবলের ড্রয়ারে রাখে, আমার টাকাও সেখানে রাখতে বাধ্য করে। তারপর যেমন খুশী খরচ হয়। ওর মতে, টাকা-পয়সার হিসেব করলে মানুষের আত্মায় কালো কালো দাগ পড়ে। ওর জামাকাপড় কেনার শখ নেই, কোনো রকম জিনিসের প্রতি লোভ নেই, সব সময় তবু অদ্ভুত এক আনন্দে মেতে থাকে।

এমনও হয়েছে, কোনো কোনো মাসের কুড়ি-বাইশ তারিখে আমরা একেবারে নিঃস্ব। বাজার করার পয়সা নেই, সিগারেট কেনারও পয়সা নেই। মাস না ফুরোলে আর কোনো জায়গা থেকে কিছুই সম্ভাবনা নেই। আমার তো এরকম অভ্যেস আছেই, কিন্তু মার্গারিটও এই দৈন্য খুব উপভোগ করে। শুধু কফির সঙ্গে শুকনো পাঁউরুটি চিবোতেই ওর দারুণ আনন্দ! কখনো অবস্থা চরমে উঠলে ও আমাকে ষড়যন্ত্রের সুরে বলে—কার কার বাড়িতে নেমন্তন্ন জোগাড় করা যায় বলো তো? ডোরিকে ফোন করবো? কিংবা ওয়াল্টার ফ্রীডম্যান তোমাকে একদিন বাড়িতে ডাকবে বলেছিল না? কিংবা ক্রিস্তফ? ক্রিস্তফ তো খুব সলিড!

কখনো কখনো আমরা হ্যাংলার মতন ঠিক সন্ধেবেলা খাওয়ার সময় নীচের তলায় ক্রিস্তফের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ক্রিস্তফ খুব সাজানো-গুছোনো মানুষ, ঝকঝকে ঘর, নিজে একটা দুটো সিগারেট খেলেও সব সময় চার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট মজুত রাখে। ওর কাছে যে-কোনো সময় পঞ্চাশ, একশো

ডলার ধার পাওয়া যায়। এবং ওর ঘরে গেলেই কিছু না কিছু খেতে বলে।

আমরা গেলে ক্রিস্তফ খুশীই হয়। ও এখনো খুব নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে মুখখানা খুব বিষণ্ণ দেখায়। মেয়েদের সম্পর্কে ওর ঝোঁক খুব বেশী; কিন্তু ঠিক কোনো সঙ্গিনী পায়নি। প্রথম কিছুদিন মার্গারিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার অনেক রকম চেষ্টা করেছিল, এখন বুঝে গেছে, এখন মার্গারিটের প্রতি ওর ব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ।

এক্‌দিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। সেদিনও আমাদের হাতে পয়সা কড়ি কিচ্ছু নেই। সন্ধে থেকে মার্গারিট আর আমি গালে হাত দিয়ে বসে আছি। আমাদের শেষ ভরসাস্থল ক্রিস্তফও বেড়াতে গেছে শিকাগোতে। ভাঁড়ার শূন্য, রাত্রে কি খাবো তার ঠিক নেই। এমন সময় টেলিফোন এল পল ওয়েগনারের স্ত্রী মেরি ওয়েগনারের কাছ থেকে। মেরি জিজ্ঞেস করলো—নীললোহিত, তুমি কি একলা আছো? তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে? তুমি কি একবার আসবে? আমার ভীষণ ভীষণ একা লাগছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি মরে যাবো! চলে এসো, এক্ষুনি এসো—

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আমি মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবে নাকি? বুড়ি কিছু খাওয়াতে পারে।'

মার্গারিট ভয় পেয়ে বলে উঠলো, 'না, না, না, না, তুমি খবরদার আমার নাম করো না! মেরি ওয়েগনার মেয়েদের একদম পছন্দ করে না, তুমি জানো না? ভীষণ পাগলামি করবে তা হলে। তুমি ঘুরে এসো।'

—না, আমিও যাবো না।

—ঘুরে এসো না, আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্য।

তবু আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না, মেরিকে নানা রকম অজুহাত দেবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই সে শুনলো না। ওদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাই, মেরি কক্ষনো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, সুতরাং আমি বেশী রূঢ় হতে পারলাম না। মার্গারিটকে বললাম, 'বসো, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

ট্যাক্সি ধরার পয়সা নেই, অনেকখানি রাস্তা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে যেতে হলো। শীতের জন্য দৌড়তে খারাপ লাগে না। এই শীতের মধ্যেও মেরি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

এখন অনেক চালু হয়ে গেছি। এখন আর মাদার-টাদার নয়। এখন দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলি—হাই মেরি! তারপর কাছে গিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে চুমু দিই। মেরি আমার হাত ধরে বললো, 'নটি বয়! এত দেরি করলে কেন. ট্যাক্সি নিতে পারোনি?'

ট্যাক্সি খুঁজেও পাইনি, এই অজুহাত এখানে খাটে না। টেলিফোন করলে

দু' মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি বাড়ির সামনে আসে।

বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। পল ওয়েগনার ওয়াশিংটন ডি-সি-তে গেছে জানি। মেরি বললো, 'দেখো, পল একটাও চিঠি লেখেনি, টেলিফোন করেনি। মেয়েটাও কিছুতেই আমার কাছে থাকবে না। মানুষ দিনের পর দিন একলা থাকতে পারে?'

আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললো, 'শুধু নিজের জন্য কারো রান্না করতে ভালো লাগে? এই শীতের মধ্যে কারুর একা খেতে ভালো লাগে?'

টেবলের ওপর অনেক রকম খাদ্য। দু'জনের জন্য ডিনার প্লেট পাতা। মেরি বললো, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো?'

মেরির কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়ানো। টেবলের ওপর একটা প্রায়-খালি জিনের বোতল। সারাদিন ধরে বোধহয় ঐ জিন খেয়েছে। বাড়ি থেকে কখনো বেরোয় না, পল না থাকলে এ বাড়িতে কেউ আসেও না, দিনের পর দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ একলা কাটানো নিশ্চয়ই কষ্টকর। যথারীতি আজও সে প্যান্ট-শার্ট পরে আছে। কোনদিন ওকে স্কার্ট বা গাউন পরতে দেখিনি। খর্বকায় বলে ওকে প্রায় একটি কিশোরের মতন দেখায়।

এত ভালো ভালো খাদ্য, কিন্তু কিছুতেই আমার মুখে রুচছে না। বারবার মনে পড়ছে, মার্গারিট অভুক্ত হয়ে বসে আছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়। আমি কী স্বার্থপর! সেদিনই প্রথম বুঝলাম, অপরকে বঞ্চিত করে নিজে বেশী খাওয়ার মর্ম কি! ইচ্ছে করছে, সমস্ত খাবারদাবার ছুঁড়ে ফেলে দিই। মেরি বারবার তাড়া দিচ্ছে—একি, তুমি খাচ্ছো না কেন? তোমার যদি জিন না পছন্দ হয়, তুমি স্কচ নিতে পারো!

ও তো কিছুই বুঝবে না।

খাওয়া কোনোক্রমে শেষ করে বললাম, 'এবার আমি যাই!'

—এক্ষুনি কি যাবে? বোকা ছেলে, জানো না, খাওয়া শেষ করে তক্ষুনি যাবার কথা বলতে নেই?

—আমার একটা জরুরি লেখা আজই শেষ করতে হবে যে!

—জরুরি লেখা অপেক্ষা করতে পারে। কোনো মেয়েবন্ধু অপেক্ষা করে নেই তো?

—না, না।

—কোনো মেয়েবন্ধু পাওনি এখনো?

—কোথায় আর পেলাম? কেউ পাত্তা দেয় না।

—পুয়োর, পুয়োর নীললোহিত। আমারই মতন লোন্‌লি!

মেরি কাছে এসে আমার ঠোঁটে চুমু খেল। এমনিতে ব্যাপারটা নির্দোষই বলা যায়। কিন্তু মেরি আমার মুখের মধ্যে ওর জিভটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

বুঝলাম, সেই যে একদিন মাদার বলেছিলাম, তার প্রতিশোধ!

মেরি বললো, 'এখানে শীত করছে? চলো, স্টোভের পাশে গিয়ে বসি। লিফ্‌ট মি, টেক মি দেয়ার! ওন্ট য়ু?'

বসবার ঘরে কৃত্রিম ফায়ার প্লেসের মধ্যে হীটার বসানো। মেরি খুব হাল্কা, তাই ওর কথা মতন ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও আবার আমাকে চুমু খেতে লাগলো। জানি এখন ও কি চায়। সোফার ওপর ওকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'দুঃখিত, আমাকে যেতেই হবে, ভীষণ কাজ, যেতেই হবে...।' প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

ফিরে এসে দেখি মার্গারিট ঘুমিয়ে পড়েছে টেবলে মাথা দিয়ে। যেন বিষণ্ণ সুন্দর একটা ছবি। চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে বুকের ওপর। ওর পিঠে আলতো করে হাত ছোঁয়াতেই চমকে জেগে উঠলো। বললো, 'তুমি খেয়ে এসেছো তো?'

আমি বললাম, 'আমি খুব খারাপ, স্বার্থপর, পাজী, নোংরা।'

—কেন, কি হয়েছে কি?

—কেন আমি তোমাকে ফেলে চলে গেলাম? কেন আমি একা একা...

—তাতে কিচ্ছু হয়নি। আমি তো কবিতা পড়ছিলাম এতক্ষণ, খুব ভালো লাগছিল।

—পাগলি মেয়ে, খালি পেটে কি কবিতা পড়া যায়?

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললাম, 'তোমার জন্য একটা কেক আর এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে এনেছি।'

ও হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! আর কি চাই? ইউ ডিজার্ভ আ কিস্‌।'

—দাঁড়াও, আগে মুখটা ধুয়ে আসি।

সিঙ্কে খুব ভালো করে মুখ ধুয়ে মেরির চুম্বনের স্বাদ মুছে ফেললাম। তারপর এসে মার্গারিটকে পুরো ঘটনাটা বললাম। ও বললো, 'এ তো খুব স্বাভাবিক। এ তো এখানে প্রায়ই হয়, এদের প্রেমহীন জীবন কিনা! চল্লিশ বছর বয়েস পার হয়ে গেলেই আমেরিকান মহিলারা বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা আলাদা হয়ে যায়, স্বামী বাইরে বাইরে ঘোরে, ওদের আর তখন কী করার থাকে বলো! তাছাড়া মেরি তো আজ ড্রাঙ্ক ছিল...'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা তৃষ্ণার্তের মতন পর পর দু' তিনটে করে সিগারেট টানলাম। মার্গারিট বললো, 'ইস্‌, এই সঙ্গে যদি একটা ওয়াইন বা এক বোতল কিয়ান্তি থাকতো! আচ্ছা, কল্পনা করে নাও না, আমরা শ্যামপেন খাচ্ছি, এই বোতল খোলা হল, পং! এবার গেলাসে ঢালছি—তির তির তির তির —এবার চুমুক দাও।'

আমি ওর বুকে মুখটা ডুবিয়ে ছটফট করতে করতে বললাম, ‘পাগলি, একদম পাগলি মেয়েটা! মার্গারিট, লক্ষ্মী সোনা, তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো না?’

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে, ‘কি জানি! এখনো বুঝতে পারি না।’

—আমি যে আর থাকতে পারছি না!

—আর একটু ধৈর্য ধরো! প্লীজ......

আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েও এই একটা জায়গায় আটকে আছি। ভালো-বাসার ওপর মার্গারিটের দারুণ বিশ্বাস। আমি আবার ভালোবাসা ঠিক কাকে বলে জানি না। ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি আর-কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি, মার্গারিটও অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে একদিনও বাইরে কোথাও যায়নি, তবু এর নাম ভালোবাসা নয়? প্রথম যেদিন ওকে বলেছিলাম—তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি—ও আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—বলো না, ও কথা বলো না, যদি মিথ্যে হয়? পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখের জিনিস যদি ভালোবাসাটাও মিথ্যে হয়ে যায়।

আমি একটু আহত হয়ে বলেছিলাম, ‘মিথ্যে কেন হবে? তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না?’

ও বিষণ্নভাবে উত্তর দিয়েছিল—কি জানি! সব সময় নিজেকে তো এই প্রশ্নই করছি। আশা করছি একদিন উত্তর পেয়ে যাবো! একথা ঠিক, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার এখানে আসতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার আদর পেতে আমার যতখানি ভালো লাগে, তেমন আর কিছুই আমার ভালো লাগে না এখন। কিন্তু ভালো-লাগা আর ভালোবাসা কি এক?

ভালো-লাগা আর ভালোবাসার সূক্ষ্ম তফাত আমি বুঝতে পারি না।

যারা ওকে চেনে, অনেকদিন দেখছে, তারা সবাই জানে, মার্গারিট অত্যন্ত ধার্মিক, স্বভাবটাও নির্মল, কিছুতেই মিথ্যে কথা বলবে না একটাও। অথচ ও দারুণ বোহেমিয়ান এবং প্রচণ্ড রোমান্টিক। একটা ভালো কবিতার লাইন পড়ে পাগল হয়ে যায়। আমাদের দেশের মান অনুযায়ী মদ্যপান ও সিগারেট খাওয়া তো গর্হিত অপরাধ, বিশেষত কোনো ধার্মিক মেয়ের পক্ষে, কিন্তু ওর এ সম্পর্কে কোনো গ্লানি নেই। ও বলে—এই জন্যই তো আমি নান্ হইনি, আমার দু' বোন হয়েছে, আমিই শুধু বাদ। আমি গোমড়া মুখে ঈশ্বরের পুজো করতে পারবো না। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আনন্দ পাবার জন্য না কষ্ট পাবার জন্য!

আমার মতন নাস্তিক এবং রীতিদ্রোহী ওর আরও কিছু সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। আমরা এখন এক বিছানায় শুয়ে ঘুমোই। মার্গারিট একদিন আমাকে

স্নান করিয়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। স্নানের ঘরে ঢুকে আমি তোয়ালে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, দরজা ফাঁক করে ওর কাছে তোয়ালে চেয়েছিলাম, ও তোয়ালে নিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকে এসেছিল।

আর একদিন আমার পেড়াপেড়িতে ও আমার সামনে সমস্ত পোষাক খুলে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম—তুমি সুন্দর। আমি একটা সুন্দর জিনিস দেখবো না কেন? এতে কি দোষ আছে?

তবু একটা জায়গায় একটা বাধা রয়ে গেছে। ওর ধারণা নারী-পুরুষের মিলন একটা পবিত্র ব্যাপার। নিছক লোভ বা বাসনার জন্য এটাকে ছোট করে ফেলা উচিত নয়। সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলেই জিনিসটা স্বর্গীয় আনন্দময় হতে পারে। আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করি না? মানুষের জীবন এত বড়, ভালোবাসার সাড়া পাবার জন্য আমরা কি অন্তত একটা বছরও অপেক্ষা করতে পারবো না?

আমি বলেছিলাম, 'মার্গারিট, তুমি শরীরের এই একটা ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন? আজকাল তো বাচ্চা-টাচ্চা হবার ভয় নেই, কত রকম জিনিস বেরিয়েছে।'

ও তক্ষুনি দৃঢ়ভাবে বলেছে, 'তুমি পাগল হয়েছো? আমি রোমান ক্যাথলিক, আমি অন্য কিছু ব্যবহার করবো? কক্ষনো না! যদি ভালোবাসার কথা টের পাই, আমি তখন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করবো না—আমি বিয়ে-ফিয়েও গ্রাহ্য করি না, যদি বাচ্চা হয়, আমি তাকে পবিত্র প্রাণ হিসেবে মানুষ করবো, যদি পথের ভিখিরিও হতে হয়, তবু তাকে নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরবো, কোনোদিন অস্বীকার করবো না......

এক-একদিন আমি থাকতে পারিনি, ওর ওপর জোর করতে গেছি। সব রকম আদরের পর কি থেমে থাকা যায়? মার্গারিট তখন কেঁদে ফেলেছে। কান্নার সময়ে ফুলে ফুলে উঠেছে ওর শরীর। আমি লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেছি। এক সময় ও অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে বলেছে—তুমি জানো না আমারও কত কষ্ট হয়। এক এক সময় থাকতে পারি না, মনে হয় নিলর্জ্জের মতন তোমাকে নিজেই মুখ ফুটে বলে ফেলি, টেক মি, টেক মি! তারপরই নিজের মুখ চাপা দিই। যদি ভালোবাসার অপমান করে ফেলি। এই দেখো, ছুঁয়ে দেখো, এখনো আমার শরীরে কত তাপ, ঠিক যেন জ্বালা করছে...শোনো নীল, তুমি যদি সহ্য করতে না পারো, যদি তোমার শরীরের দাবি খুব বেশী হয়, তুমি অন্য যে-কোনো মেয়ের কাছে যেতে পারো, এরকম মেয়ে তো এখানে অনেক পাবে—আমি কিন্তু তবুও আসবো, আমাকে তাড়িয়ে দিও না—

সেই সময় মার্গারিটের মুখ কী অপরূপ সুন্দর দেখায়। মনে হয় বাঁতিচেল্লি ওকে দেখেই সব ছবি এঁকেছেন। মার্গারিটকে ছেড়ে আমি কি অন্য আর

কোনো মেয়ের কাছে যেতে পারি? আমি কি পশু!

মাসের গোড়ার দিকে যখন আমাদের হাতে বেশ টাকা-পয়সা থাকে, তখন আমরা ঘন ঘন পার্টি দিই আমার ঘরে। আমরা বাইরে বেশী ঘোরাঘুরি করি না, অন্য বড় বড় পার্টিতেও যাই না, তাই অন্যদেরই ডাকি আমাদের এখানে। মার্গারিট এই ধরনের পার্টি খুব ভালবাসে।

এখন আর শুধু তুষারপাত নয়, রাস্তাঘাটে কয়েক ফুট বরফ জমে আছে। উইলো গাছগুলোর গায়ে থোকা থোকা ফুলের মতন বরফ। নানারকম তাদের আকৃতি। গাড়ি চলার রাস্তাগুলো থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বরফ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে একটা দোকানের মাথায় একটা বিরাট ঘড়ির মতন ব্যারোমিটার বসানো, তাতে দেখা যায় তাপাঙ্ক কত নামছে। যেদিন কাঁটাটা শূন্যের নিচে নেমে গেল, সেদিন আমরা সেই উপলক্ষে একটা মস্ত বড় পার্টি দিলাম।

কয়েক ডজন বীয়ার, দু' তিন বোতল স্কচ আর কিছু ওয়াইন কিনে আনলাম। মার্গারিট রান্না করলো চিংড়ি মাছ আর মাসরুম মেশানো ভাত; ম্যাসড্ পোটাটো বা আলুসেদ্ধ মাখা, মাছের রোস্ট, স্যালাড, আর গরম গরম স্টেক বা মাংসের চাক্তি ভেজে দেবে। তারপর স্ট্রবেরি আর ক্রীম। বেশ এলাহি ব্যবস্থা। পাঁচটি যুগল এসেছে, আমার ঘরে জায়গা কম বলে বসতে হয়েছে মেঝেতেই। কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে আড্ডা জমে।

ক্রিস্তফের সর্দি সারেনি বলে ও আসতে চাইছিল না। নিচ থেকে জোর করে ধরে আনলাম। এইটুকু জায়গায় নাচের সুবিধে নেই বলে সবাই মিলে গান ধরলাম। ডোরি বেশ ভালো পল্লীগীতি গায় এবং নিগ্রো ব্লু। একটা গান বার বার গাইতে লাগলো—ভার্জিন মেরি হ্যাড ওয়ান সান, ও হেলিলুইয়া। সাম কল হিম মাইকল্, আই কল হিম ডেভিড, ও হেলিলুইয়া।

মার্গারিট গাইলো কয়েকটা ফরাসী গান। তার মধ্যে একটা গান প্যারিসের বেশ্যাদের, অথচ ফ্রান্সে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও নাকি গানটা জানে: জ্য শার্শঅ ফরতুন তূতাল্তু দু শা নোয়া ও ক্লেয়ার দ্য লা লুন আ মমার্ত ল্য স্যয়ার...কী করুণ সুর গানটার। এই গানটারই একটা লাইন পরে অনেকদিন আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করেছি: জ্য নে পা দারজঁ—আমার টাকা নেই, আমার টাকা নেই।

সবাই আমাকে একটা গান গাইবার জন্যও চেপে ধরলো। খুব বেশী সাধাসাধির প্রয়োজন হলো না অবশ্য, আমি প্রায় আর একবার সাধিলেই গাহিব অবস্থায় বসে ছিলাম। কিছু না ভেবেচিন্তেই আমি একটা গান ধরলাম:

অ্যারাইজ ই প্রিজনার অব স্টার্ভেশান

অ্যারাইজ ই রেচেড অব দা আর্থ
ফর ফাস্ট ইজ থান্ডার্স কনডেমনেশান
এ্যান্ড দি নিউ ওয়ার্ল্ড ইজ ইন দা বার্থ...

খানিকটা গাইবার পর দেখলাম, কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না, সবাই গম্ভীর। একটু খটকা লাগলো। আমার সংগীত-প্রতিভার এমন সমাদর আগে তো কখনো দেখিনি!

একটু থামতেই স্ট্যান বললো, 'এটা কি গান? একটা বাংলা গান গাইছো না কেন?'

ক্রিস্তফ আমার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'এটা তো কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল—এটা কি এখানে গাইতে হয়?'

—কেন, কি হয়েছে?

—তোমার পেছনে পুলিশ লাগলে বুঝতে পারবে।

মার্গারিট বললো, 'কিন্তু গানটা তো চমৎকার।'

সম্ভবত কিছুদিন আগে সেই রাশিয়ান কবিকে দেখে কিংবা মার্গারিটের গানে দারিদ্র্যের কথা ছিল বলেই গানটা আমার মাথায় এসেছিল। যাই হোক, গানটা একবার গেয়েছি যখন, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতেই হবে। আমি বললাম, 'পৃথিবীতে যত ভালো গান আমি শুনেছি, এটা তার মধ্যে একটা। ভালো গান হিসেবেই এটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া এ গানটা পল রোবসনের রেকর্ড আছে, আমেরিকানরা কি শোনে না?'

ক্রিস্তফ বললো, 'তা শুনতে পারে। কিন্তু তুমি একজন বিদেশী, তোমার ব্যাপার আলাদা। যদি শুধু শুধু ঝঞ্ঝাটে পড়ো!'

মার্গারিট বললো, 'আমেরিকানরা অবশ্য এরকম অনেক বোকামি করতেও পারে। একবার আমি শুনেছিলাম নিউ ইয়র্কে...'

ক্রিস্তফ চুপ করে গেল। সে নিজে কমিউনিস্ট দেশের লোক, সেইজন্যই সে এখানে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

কিন্তু মার্গারিটের কথায় স্ট্যান বেশ চটে গেল। সে শ্লেষের সঙ্গে বললো, 'যে-কোনো সুযোগে আমেরিকানদের নিন্দে করতে পারলে ফ্রেঞ্চ পিপলদের বেশ আনন্দ হয়, তাই না? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমরাই ফ্রান্স উদ্ধার করেছিলাম, প্যারিস শহরটাকে বাঁচিয়ে ছিলাম কিনা। উপকারীকে আক্রমণ করাই নিয়ম।'

মার্গারিট উত্তর দিতে যেতেই ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। সবাই মিলে থামানো হলো ওদের। জর্জ নামে একটি ছেলে ঈষৎ নেশাগ্রস্ত জড়িত গলায় বললো—টু হেল্ উইথ আমেরিকা, টু হেল্ উইথ ফ্রান্স। আর উই গড ড্যাম ডিপ্লোম্যাটস্ হিয়ার? সিংগ বেবি, সিংগ।

সে ডোরিকে একটা ধাক্কা মারলো। ডোরি আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললো, 'নীল, তোমাকে একটা ব্যাপারে অ্যাসিওর করতে পারি, তুমি যে-রকম ইচ্ছে গান গাইতে পারো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। ইট্‌স আ ফ্রি কাণ্ট্রি। আমরা চাইছিলাম, তুমি তোমার নিজের দেশের একটা বাংলা গান গাইবে।'

আমি যদি ঐ গানটারই বাংলায় নজরুলের অনুবাদ শুনিয়ে দিতাম, কেউ কিছু বুঝতো না। চেপে গেলাম। অন্যরা গান শুরু করলো। কিন্তু সুর কেটে গেছে, আর জমছে না।

পার্টিটা তার পরেও আর জমলো না। খাওয়াদাওয়ার একটু পরই ক্রিস্তফ হঠাৎ সিঙ্কে গিয়ে বমি করলো। ও সাধারণত হুইস্কি-টুইস্কি বেশী খায় না—কিন্তু কোনোক্রমে মাথায় নেশা চড়ে গেছে। ওকে শুইয়ে দিয়ে আসা হলো ওর ঘরে।

তার একটু পরেই ডোরির একটা টেলিফোন এলো আমার ঘরে। দারুণ দুঃসংবাদ। ডোরির বাড়ির একটি মেয়ে টেলিফোন করে জানালো যে লিণ্ডা সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাকসিডেণ্ট করেছে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। লিণ্ডা সেই টেক্সাসের মেয়েটি, যে মার্গারিট আর ডোরির সঙ্গে প্রথম এসেছিল আমার এখানে। পরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, খুব ডাকাবুকো ধরনের মেয়ে, দুর্দান্ত গতিতে গাড়ি চালায়। অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে সিডার র‍্যাপিডসে, ডোরি তক্ষুনি এখানকার একজনের গাড়িতে চলে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গেল অন্য সবাই। মার্গারিট একটু রয়ে গেল জিনিসপত্র খানিকটা গুছিয়ে রাখবার জন্য। জিনিসপত্র তুলতে আমি ওকে সাহায্য করলাম খানিকটা। মার্গারিট ডিসগুলো এখনই ধুয়ে রাখবে—এবং আমার সাহায্য ও চায় না। আমি ওকে সেখানেই রেখে ঘরে ফিরে এসে গেলাসে আরও খানিকটা স্কচ ঢেলে বসলাম। উৎসব অকস্মাৎ ভেঙে গেলে মেজাজটা ভালো লাগে না।

হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি বেসিনের সামনে গিয়ে, দেখি, মার্গারিট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

আরও বেশী কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—লিণ্ডা...লিণ্ডা—এত ভালো মেয়ে...

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'ও তো এখনও...মানে...ওরা বলল...বেঁচে উঠবে।'

—এখন কত কষ্ট পাচ্ছে? লিণ্ডা কত কষ্ট পাচ্ছে!

কোন্ ভাষায় ওকে সান্ত্বনা দেবো! জানিই তো মার্গারিটের মনটা কত নরম। কিছুতেই ও অন্য কারুর বিপদ বা কষ্টের কথা সহ্য করতে পারে না।

ওকে ধরে ধরে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে দিলাম। কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না। একটু আগে যে আমেরিকানদের নিন্দে করছিল, এখন সে একটি আমেরিকান মেয়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদছে।

ওকে জোর করে খানিকটা ব্র্যান্ডি খাওয়ালাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে খানিকটা শান্ত হলো। ওকে কথা দিলাম, কাল সকালেই ওকে সিডার র‍্যাপিডস্-এর হাসপাতালে নিয়ে যাবো। এবং ওকে কবিতা পড়ে শোনাতে হলো।

রাত দেড়টা বাজে। হস্টেলে ওকে একটার মধ্যে ফিরতে হয়। শনিবার দিন অতিথিরা রাত দুটো পর্যন্ত হস্টেলের মধ্যে থাকতে পারে। আমিও গেছি কয়েকবার ওর ঘরে; মেয়েদের হস্টেলে জীবনে আগে কখনো ঢুকিইনি। তাও রাত দুটো পর্যন্ত সেখানে থাকা! আমার নিজেরই খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু অন্য কেউ কিছু মনেই করে না।

আজ অবশ্য মার্গারিট হস্টেলে ফিরবে না। আজ আবার যাবে বব বাকল্যান্ডের বাড়ি পাহারা দিতে। বব বাকল্যান্ড বিরাট ধনী, প্রায়ই সপরিবারে ইওরোপ যান, সেই সময় বাড়ি পাহারা দিয়ে মার্গারিটের একশো ডলার উপার্জন হয়।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবু বেশী হুইস্কি খেয়েছিলাম বলে হঠাৎ একবার বুঝি আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। মার্গারিট বললো, 'এই, তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো। আমি তাহলে চলি এবার।'

বই মুড়ে রেখে মার্গারিট উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মার্গারিট প্রবল আপত্তি জানাতে লাগলো। কিন্তু সেটা তো কোনো কথা হতে পারে না। বাইরে নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। তুষারপাতের সময় মোটেই বেশী শীত করে না। কনকনে শীত করে যখন হাওয়া দেয়, তখন মনে হয় নাকটা যেন খসে পড়বে শরীর থেকে। এখন তুষারপাত হচ্ছে সোজাসুজি-ভাবে, হাওয়ায় উড়ছে না, সুতরাং কোনো বিপদ নেই। গরম গেঞ্জি, তারপর জামা, তারপর সোয়েটার, তার ওপরে ওভারকোট চাপিয়ে, গলায় মাফ্‌লার এবং হাতে গ্লাভস পরে নিলাম। মার্গারিটকেও পরিয়ে দিলাম যাবতীয় গরম জামাকাপড়। ওর ওভারকোটের নিচে জড়িয়ে দিলাম আমার দেশ থেকে আনা শাল।

নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করছে এখন। চার-পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। মার্গারিটের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এত জামা সত্ত্বেও শীতে মাঝে মাঝে কাঁপন ধরাচ্ছে অবশ্য, তবু তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড এক ভালো-লাগা। এর নামও কি ভালো-লাগা না ভালোবাসা? মাঝে মাঝে আমি ওর মুখ চুম্বন করছি। ও গ্লাভস পড়েনি

বলে হাতটা গরম করার জন্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার কোটের মধ্যে। এক জায়গায় খানিকটা জলমতন জমেছে, সেখানটা আমি মার্গারিটকে কোলে করে নিয়ে গেলাম। আমাকে সব সময় শক্ত বরফের ওপর সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। একবার পা পিছলোলেই আলুর দম!

আয়ওয়া নদীটা একদম জমে শক্ত হয়ে গেছে। যেন ধপধপে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা রাস্তা। মার্গারিট বললো, 'চলো, আমরা ব্রীজের ওপর দিয়ে না গিয়ে, নদীর ওপর দিয়েই হেঁটে যাই।'

—চলো।

ব্রীজ থেকে নামতে গিয়েও থেমে গিয়ে ও বললো, 'না, থাক। যদি তোমার কোনো বিপদ হয়?'

—কেন?

—কোথাও বরফ একটু পাতলা থাকলে হুস করে ভেঙে ভেতরে ঢুকে যেতে পারো। তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। দিনের বেলা আসবো।

—ওরে পাগলি, তাতে শুধু আমার একার বিপদ হবে কেন? তুমিও তো পড়ে যেতে পারতে।

—সে আমার যা হয় হতো, কিন্তু তোমার কোনো বিপদ হবে, এ কথা ভাবলেই আমার...

কি এর নাম? ভালোবাসা না?

অর্ধেকের বেশী পথ আসবার পর মার্গারিট থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আপন মনে বললো—আমি একটা ব্লাডি ফুল।

—কেন, কি হলো?

—এই ঠান্ডার মধ্যে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন? আমিই তো তোমার ওখানে থেকে গেলেই পারতাম। কাল ভোরে চলে আসতাম।

—চলো, ফিরে চলো।

—এখন ফিরতে গেলে বেশী পথ যেতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করো না—তুমি এসো—তুমি বাকল্যান্ডের বাড়িতেই থেকে যাবে। তোমাকে তো ভোরে ফিরতেও হবে না। রাজী!

—নিশ্চয়ই রাজী। কোনো অসুবিধে নেই তো?

—কিসের অসুবিধে! বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে জুতোর বরফ ঝেড়ে ফেলে ঢুকলাম ভেতরে। হঠাৎ ভেতরে এলে যেন বেশী শীত করে। আমি মার্গারিটের মুখে আর বুকের জামার মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ওকে গরম করে দিতে লাগলাম। ও আমার বুকে জোরে জোরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

একটা কুকুর ডেকে উঠলো ঘাউ ঘাউ শব্দে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে

দেয়। মার্গারিট বললো, 'ভয় নেই, বাঁধা আছে।'

বব বাকল্যাণ্ডের বাড়িটা হলিউডের ফিলমের বাড়ির মতন সাজানো: বিরাট বিরাট ঘর। বসবার ঘরের বাইরেই অলিন্দে একটা বার কাউণ্টার রয়েছে. তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি বোতল সাজানো। মার্গারিট বারের ওপাশে গিয়ে বললো, 'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান আই সার্ভ ইউ?'

কাউণ্টারের ওপর কনুই রেখে মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি বললাম, 'শ্যাল আই হ্যাভ টু পে? অর, অন দা হাউজ?'

—অন দা হাউজ, অফকোর্স।

—কোনিয়াক, সিল ভু প্লে।

গেলাসে ফরাসী ব্র্যাণ্ডি ঢেলে বললো—ইসি মঁসিউ।

—ম্যার্সি। আ ভত্র্ সান্তে।

এইরকম খেলায় আমরা খানিকক্ষণ হাসাহাসি করলাম। তারপর আমি কাউণ্টারের ওপর উঠে বসে ওর গলা ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'দুষ্টুমণি. এ বাড়িতে আমাকে আগে নিয়ে আসোনি কেন?'

ও লাজুকভাবে বললো, 'আমি একটা বোকারাম কিনা। মনে আছে, যেদিন তুমি প্রথম আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলে? সেদিনই আমি ভেবেছিলাম, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ও ফিরে গেল কেন? এত বড় বাড়ি, ও তো অনায়াসেই এখানে থাকতে পারতো। লজ্জায় তোমাকে কথাটা বলতে পারিনি। এখন ইচ্ছে করে ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড় মারতে।'

—মার্গারিট, আমাকে কি একটুও ভালোবাসো না?

—তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালোবাসতে চাই।

—আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি. তার চেয়ে বেশী কি করে ভালোবাসতে হয় জানি না। শোনো. তোমাকে একটা কথা বলবো?

—বলো।

—আমি এখানে আসবার আগে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কিছুতেই মেম বিয়ে করবো না। কিন্তু তুমি তো মেম নও। তুমি তো কোনো দেশেরই মেয়ে নও। তুমি শুধু আমার। কাল-পরশুই আমরা বিয়ে করতে পারি না?

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। 'শোনো নীল. তুমি কি ভেবেছো, বিয়ের জন্যই আমার সব কিছু আটকে আছে? আমার ওরকম নীতিবোধ নেই। আই ডোণ্ট কেয়ার ফর ম্যারেজ। ওটা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানলেও হয়, না মানলেও হয়—বেশীর ভাগ মানুষই মানে কিছু সুবিধের জন্য। আমি তো কোনো সুবিধের কথা ভাবছি না। আমি শুধু ভাবছি, আত্মার কাছে যাতে কোনো ছলনা না করি। তুমি কি খুব ব্যস্ত হয়ে গেছো? আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যায় না?'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সত্যি, বড্ড অধৈর্য হয়ে পড়ি। তোমার চেয়ে আমি অনেক দুর্বল।'

আমরা দোতলায় গিয়ে সব কটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সব ক'টা ঘরই গোল। অন্তত চারখানা শয়নকক্ষ, তার প্রতিটিতেই আরামের সব রকম উপকরণ। প্রকাণ্ড খাটে দুধ-সমুদ্রের মতন বিছানা পাতা। মস্ত বড় কাচের জানালা, বাইরে দেখা যায় ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, অথচ ভেতরটা উষ্ণ।

মার্গারিট বললো, 'দেখেছো, আমরা এখানকার যে-কোনো ঘরের যে-কোনো বিছানায় শুতে পারি। কিন্তু প্রতিবাদ হিসেবে আমরা এর কোনো-টাতেই শোবো না।'

—কিসের প্রতিবাদ?

—এদের এত ঐশ্বর্যের! দিস ভালগার ডিসপ্লে অব ওয়েল্থ! এদের এত আরামপ্রিয়তা, এদের কালচার মানেই হচ্ছে কমফর্ট...আমরা আজ ঘরের মেঝেতে শোবো।

দুটো কম্বল নিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, তাও কম আরামদায়ক নয়। পাশাপাশি শুয়ে রইলাম অনেক অনেকক্ষণ ঘুমহীন চোখে।

॥ ১০ ॥

দেখতে দেখতে বছর প্রায় ঘুরে এলো। পল ওয়েগনার একদিন তার অফিস ঘরে ডেকে একটা ফর্ম দিয়ে বললো, 'এটায় সই করে দাও!'

—কি এটা?

—তোমার আগামী বছরের স্কলারশীপের জন্য দরখাস্ত। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে হয় কিনা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'এতে তো অনেকগুলো ঘর ভর্তি করতে হবে। আমি পরে ফিল আপ করে তোমাকে দিয়ে যাবো।'

কাগজটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে। আর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আরও এক বছর এখানে থাকবো কি থাকবো না? কেন থাকবো? কেন চলে যাবো? আমার কোনো পিছুটান নেই।

তবু একটা কথা কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। আমার জায়গা এখানে নয়। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র বা গবেষক, তাদের এখানে অনেক রকম উপকার হতে পারে বটে, কিন্তু আমি কি মাথামুণ্ডু করছি?

আমি বেড়াতে ভালোবাসি। মাঝে মাঝেই এখান থেকে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ি, উঠে পড়ি যে-কোনো দিকের বাসে, তখন চক্ষু ও মন ভরে যায়। প্রকৃতি এ দেশে সম্পূর্ণ অকৃপণ। সব কিছুরই মধ্যে যেন বিরাটত্বের স্পর্শ আছে। খুব উঁচু কোনো পাহাড় নেই আমেরিকায়, এ ছাড়া আর সব কিছুই বিশাল।

ভ্রমণ ছাড়া, যখন থাকতে হয় আয়ওয়ায়, তখন কিছুই করার থাকে না। কিংবা কাজের নামে ছেলেখেলা। মাঝে মাঝে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাছাড়া সর্বক্ষণ নিজের ঘরে। দু'একটা প্রবন্ধ, কিছু কবিতার অনুবাদ করেছি অতি-কষ্টে, তবু সব সময়েই মনে হয় যেন পণ্ডশ্রম। অতি উৎসাহী দু' চারজন ছাড়া এসব জিনিস এদেশে আর কার কাজে লাগবে? সোয়াহিলি ভাষার কবিতা যদি অনুবাদ হয় বাংলায়, ক'জন পড়ে? তাছাড়া আমার ইংরেজি শুদ্ধ করে দেবার ভার পড়েছে যার ওপর, তার সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হয়। শ্মশানবন্ধুর ইংরেজি যখন সে বলে 'পল বেয়ারার', তখন ঠিক মেনে নিতে পারি না। পল বেয়ারার শুনলেই কালো পোষাক পরা কিছু গম্ভীর চেহারার

মানুষের চেহারা মনে পড়ে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের কোমরে-গামছা-বাঁধা, বল হরি হরিবোল চিৎকার করা ছোকরাদের কোনো মিলই নেই। তখন মনে হয়, এই অনুবাদ-ফনুবাদ আমার কম্মো নয়। আমার কাজ আমার নিদের দেশে। সেখানে আমি জলের মাছ!

পল ওয়েগনার অবশ্য আমার কর্মহীনতা বা আলস্যকেও উৎসাহ দেয়। সে বলে, কোনো চিন্তা নেই, দেখো না, এর থেকেই একদিন না একদিন কাজের উৎসাহ বেরিয়ে আসবে। তোমার নিজস্ব কাজ। প্রত্যেক মানুষেরই প্রস্তুতি দরকার। সেই প্রস্তুতি যদি এক বছর, দু' বছর বা তিন বছরেও হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। লোকটি সত্যিই ভালো।

এদেশের সাধারণ লোকেরা অধিকাংশই তো ভালো মানুষ। পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ মানুষের মতনই। এদের অবস্থা বেশী সচ্ছল বলেই অন্যান্য বিলাসিতার মতন দয়ালু হবার বিলাসিতাও করতে পারে। সারা সপ্তাহ দুর্দান্ত দৈত্যের মতন পরিশ্রমের পর সপ্তাহান্তে প্রাণভরে ফূর্তি করে—কিন্তু চার্চগুলি কখনো ফাঁকা থাকে না। এরা স্বভাবতই পরোপকারী, সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। আর একটা খুব বড় গুণ, এরা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে না। অন্যের কথা খুব মন দিয়ে শোনে, বিদেশী অতিথির নাম যতই কঠিন হোক, ঠিক মনে রাখার চেষ্টা করে এবং কোনো একটা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে পরিষ্কার বলে, এটা তো জানি না আমি। আমাদের মতন কোনো একটা বিষয়ে কিছু না জেনে কিংবা অর্ধেক জেনেও অনেকক্ষণ কথা বলার অভ্যেস নেই এদের। এবং কিছুতেই অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাবে না। যেহেতু আমেরিকানদের কোনো ঐতিহ্য নেই এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছে, তাই এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ অত্যন্ত প্রবল।

এক এক সময় মনে হয়, বড় শহরের বদলে আমি এই আধা গ্রামে থেকেছিলাম বলেই এদেশের মানুষগুলোকে ভালো করে চিনতে পেরেছি! এই শান্ত নিরুপদ্রব জীবন দেখে বিশ্বাসই করা যায় না এদেশেই আছে কু ক্লুক্স ক্ল্যান বা বার্চ সোসাইটির মতন হিংস্র দল! অ্যালাবামার পুকুরে দুটি নিগ্রোর মৃতদেহ ভাসতে দেখে কয়েকটি সাদা ছেলে মন্তব্য করেছিল, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে, আমরা তো মাছেদের খাদ্য হিসেবে মাঝে মাঝেই নিগারের মাংস ছুঁড়ে দিই! অবশ্য আমাদের দেশেও এখনো হরিজন হত্যা হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তা প্রধান খবর হয় না।

শুধু সাদা-কালোর দ্বন্দ্বই নয়। দেশ জুড়ে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা বা রোমহর্ষক ডাকাতির খবর শুনে মাঝে মাঝে বুক কেঁপে ওঠে। তার ওপরে আছে এফ বি আই এবং সি আই এ-র কীর্তিকলাপ। যে-কোনো

সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ এত প্রবল, অথচ সরকারী নীতিতে যেন তার স্থানই নেই। এফ বি আই দেশের বিশিষ্ট লোকদের বাথরুমে পর্যন্ত ওত পেতে থাকে, আর সি আই এ অন্য রাষ্ট্রগুলির রান্নাঘরেও নাক গলায়। সি আই এ-র কার্যকলাপ এতই গোপন আর জটিল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতন সে মাঝে মাঝে নিজের স্রষ্টাকেও আঘাত করতে যায়। সি আই এ নাকি তার প্রধান কর্তার ওপরেও তার অজ্ঞাতসারে নজর রাখে। কে সেই হুকুম দেয়? পৃথিবীর যে-কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান খুন বা বড় বড় হত্যা-কান্ডের পিছনে সি আই এ'র ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠলে তা চট করে অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডির হত্যার পরেও তার পেছনে সি আই এ'র হস্তক্ষেপের দৃঢ় অভিযোগ উঠেছিল।

তবে, এদেশের সংবাদপত্রগুলি সি আই এ'র চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান এবং তৎপর। সি আই এ'র বীভৎস এবং অসংখ্য চোরাগোপ্ত কুকীর্তির খবর এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রেই প্রমাণ সহযোগে ছাপা হয়ে যায়। সি আই এ আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারেনি। এদেশের বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, বড় বড় মনীষী, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতনই, এখানে অপরাধ ও পাপের আকারও প্রকান্ড। অধিকাংশ আমেরিকানের সঙ্গে আলাদা কথা বললে দেখা যাবে সে চমৎকার মানুষ, কিন্তু সব মিলিয়ে দেশটা কোন্ দিকে যাচ্ছে, কেউ জানে না!

অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। একটা রাস্তার মোড়ে দেখলাম চমৎকার একটা টেবল ল্যাম্প পড়ে আছে। আমার একটা টেবল ল্যাম্প দরকার, এবং জিনিসটা এতই সুন্দর যে আমার নেবার ইচ্ছে হলো। নিলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। এদেশে পুরোনো জিনিস বিক্রি হয় না বললেই চলে। মাত্র দু'তিন বছরের পুরোনো ঝকঝকে চেহারার হাজার হাজার মোটর গাড়ি ক্রেতার অভাবে অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ডে পড়ে থাকে। নিত্য নতুন ফ্যাসন অনুযায়ী জিনিসপত্র বদলানো এদেশের রেওয়াজ। পুরোনো অটুট জিনিসপত্র এরা অবশ্য নষ্ট করে না, বড় বড় রাস্তার মোড়ে সযত্নে রেখে আসে. অন্য কারুর দরকার হলে তুলে নিয়ে যেতে পারে। গরিবরা বা বিদেশী ছাত্ররা এইসব জিনিস নিয়ে গিয়ে ঘর সাজাতে পারে অনায়াসেই। অবশ্য পুরোনো মোটর গাড়ি এইভাবে ফেলে যাওয়া যায় না, পার্কিং স্পেশ নষ্ট হচ্ছে বলে পুলিশ ফাইন করে, সেইজন্যই অনেকে পুরোনো গাড়ি পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে গিয়ে নিচের খাদে ফেলে দিয়ে দুর্ঘটনা বলে চালায়। ভেতরে আরোহী না থাকলে এইসব 'দুর্ঘটনায়' ইন্সিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেয় না।

টেবল ল্যাম্পটা আমার বেশ পছন্দ হলো, কিন্তু সেটা তুলে নিয়েও আবার

রেখে দিলাম। কী হবে এত সব জঞ্জাল বাড়িয়ে? আমি আর এখানে কতদিন থাককেবা? আমার কি এখানে শিকড় আছে? খাদ্যের অভাব নেই প্রচুর আমোদ-প্রমোদের উপকরণের অভাব নেই, তবু মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা। এদেশে কেউ কাজ না করে বসে থাকে না, সেইজন্যই মনে হয়, আমাকেও কিছু কাজ করতে হবে। এবং আমার কাজ এখানে নয়। বিভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল গরিব এক দেশেই আমার নিয়তি বাঁধা।

এখানে এখন একমাত্র আকর্ষণ মার্গারিট। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারি না! ওর জন্য আমি দেশ-কাল-সমাজ সবই ত্যাগ করতে পারি। এমন সারল্যময় মাধুর্যের স্পর্শ তো কখনো জীবনে আর পাইনি। এর চেয়ে বেশী কি আছে? যতক্ষণ ওর সঙ্গে থাকি—তখন আর পৃথিবীর কোনো কথাই মনে পড়ে না।

যখন মার্গারিট থাকে না, যখন আমি একা, তখন প্রায়ই থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। পুরুষ মানুষ হিসেবে আমার মধ্যে একটা ছটফটানি জাগে। কাজ ছাড়া পুরুষ মানুষ বাঁচতে পারে না। এখানে একটা চাকরি-বাকরি অনায়াসে জুটিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু সেরকম কাজ তো কখনো করতে চাইনি। আমার নিজস্ব কিছু কাজ থাকার কথা ছিল না? কিছু লেখার চেষ্টা করলেও মন বসে না। বাংলা ভাষার সাহচর্য ছাড়া বাংলায় লেখা যায় না। এখানে একদিনও বাংলায় হাসতে পর্যন্ত পারি না। স্থানীয় বাঙালীরা আমার সংসর্গ ত্যাগ করেছে। আমার ঘরে সব সময়েই কোনো মেয়েছেলে থাকে বলে তারা কেউ কেউ আমাকে হিংসে, কেউ কেউ ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে মেশার খুব একটা আগ্রহও আমি কখনো বোধ করিনি, কেউ ঠিক আমার টাইপ নয়।

মার্গারিটকে রিসার্চ শেষ করার জন্য এখানে আরও অন্তত দু' বছর থাকতে হবে। সেই দু' বছর আমি কি করবো? টেবলের ওপর পল ওয়েগনারের দেওয়া ফর্মটা এখনো রাখা আছে—কয়েকদিন ওর সঙ্গে দেখাই করিনি।

শীত শেষ হয়ে বসন্তকাল এসে গেছে। রাস্তার দু' ধারের জমাট বরফ ফাটিয়ে প্রথম একদিন একটা ঘাসের মতন চারাগাছ উঠেছিল। কয়েকদিন বাদেই দেখলাম তার ডগায় সিঁদুরের টিপের মতন একটা লাল ফুল। এ যেন প্রাণ-শক্তিরই অপূর্ব প্রকাশ। এতদিন প্রচন্ড শীত আর বরফের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল গাছটা। মার্গারিট সেই ফুলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল, হোয়াট আ কিউট লিট্‌ল থিং! এদেশে লিট্‌ল কথাটা খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে। জিভের ডগায় আদর করার মতন বলে, লিল্‌ল!

আস্তে আস্তে আরও কয়েকটা ফুলগাছ মাথা তুললো। তারপর অজস্র ফুলের সমারোহ। নদীর দু' ধারে চেরি গাছগুলোতে থোকা থোকা সাদা ফুল।

বড় বড় বাড়িগুলোর বিশাল দেওয়াল জোড়া নীলমণি লতা। আমাদের বাড়ির পর্চের সামনেই দুটি ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফ্লোরা গাছ। কে জানতো এর ফুল এত সুলভ! বসন্তকালে ব্লুমিংটন ইন্ডিয়ানায় বেড়িয়ে এলাম কয়েকদিনের জন্য।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে মার্গারিট ফিরে এলো বেশ উত্তেজিতভাবে। হাতে একটা টেলিগ্রাম। ফ্রান্স থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ওর মায়ের খুব অসুখ। এক্ষুনি চলে এসো।

টেলিগ্রামটা অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলো মার্গারিট। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে চায় না। বারবার বলতে লাগলো—আমার মায়ের গত কুড়ি বছরের মধ্যে একবারও অসুখ করেনি! কোনোদিন দেখিনি মাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে। বাবা তো খুব নিষ্কর্মা, মা-ই বাড়ির সব কাজ করেন!

আমি বললাম, 'কুড়ি বছর যার অসুখ করে না, তাঁর যে কখনো অসুখ করবেই না, এর তো কোনো মানে নেই!'

—না, তুমি জানো না! এর অন্য মানে থাকতে পারে। আমি তো প্রতি বছর একবার করে বাড়ি যাই! এবার শীতকালে যাইনি, তাই হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

তারপর লাজুকভাবে বললো, 'আজকাল বেশী চিঠিও লিখতাম না। তোমার জন্যই তো—একদম সময় পাইনি!'

—যাও না, তাহলে একবার ঘুরে এসো।

—কিন্তু আমার যে অনেক কাজ। মঁসিউ অ্যাসপেলের সঙ্গে আমার থীসিসের স্কীম নিয়ে বসবার কথা—

সন্ধ্যের দিকে মার্গারিট দুর্বল হয়ে পড়লো। যদি সত্যিই মায়ের অসুখ হয়? মাকে একবার দেখবে না? বছরের পর বছর বাড়ি থেকে অনেক দূরে থেকেছে মার্গারিট, কিন্তু এখন ওর অনবরত বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগলো। আমাকে বোঝাতে লাগলো ওর খুঁটিনাটি বাড়ির বর্ণনা। কোথায় বাগান, কোন কোন গাছ ওর নিজের হাতে পোঁতা, কোন গাছের নিচে ওর বাবা রোজ চেয়ার পেতে বসেন, কোথায় ওর মা চীজ্ শুকোতে দেন—অবশ্য রোদ ওঠে খুবই কম।

খেতে বসে আমরা ঠিক করলাম, মার্গারিটকে যেতেই হবে। ও একবার শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বললো, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমার একলা যেতে ভয় করছে।'

আমি বললাম, 'আমি? তোমার বাড়িতে? তা কি সম্ভব?'

সত্যি সম্ভব নয়। ওদের গোঁড়া ধার্মিক বাড়িতে এরকম একজন অচেনা পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। তবু মার্গারিট বললো, 'তুমি যদি যেতে, আমরা এক সঙ্গে ফ্রান্সে বেড়াতাম। তোমাকে নিয়ে যেতাম আলজাস

লোরেনের সেই ঝর্ণাটার কাছে।'

—যেখানকার জল পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে পরিষ্কার?

—হ্যাঁ. এমন কিছু নাম করা নয় ঝর্ণাটা, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল... তোমাকে দেখাতাম...যদিও তোমারও সে কথা মনে হতো...

মার্গারিটের চোখের দিকে তাকিয়েই যেন আমি সেই ঝর্ণাটা দেখতে পেলাম; আস্তে আস্তে বললাম. 'নিশ্চয়ই যাবো. পরে এক সময় নিশ্চয়ই যাবো—'

এবার সমস্যা দাঁড়ালো টাকা জোগাড় করার। মার্গারিটের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া উচিত। শিকাগোতে লং ডিসটেন্স কল্ করে জানা গেল. পরশুর আগে টিকিট পাওয়া যাবে না। যাওয়া-আসায় অন্তত আটশো ডলার লাগবে।

আমাদের দুজনেরই সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। ব্যাংকে দশ পনেরো ডলার আছে কিনা সন্দেহ। মার্গারিট পাগলের মতন টাকা খরচ করে। টাকা জিনিসটা ওর সহ্য হয় না. হাতে এলেই কোনোক্রমে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। মাসে বই কেনেই একশো দেড়শো ডলারের। কোনো একটা ভালো বই দেখলে কিনবেই!

মাসের মাঝামাঝি বলে অবশ্য আমাদের দু' জনেরই কিছু টাকা ছিল ড্রয়ারে। শ' দেড়েক ডলারের মতন। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে? পরদিন মার্গারিট সারা সকাল ঘুরে একশো কুড়ি ডলার জোগাড় করে আনলো. কারা যেন ধার নিয়েছিল। আমি পল ওয়েগনারের কাছে আমার দু' মাসের টাকা অগ্রিম চাইতে গেলাম. তাতে অন্তত শ' পাঁচেক ডলার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দারুণ দুঃসংবাদ পেলাম. পল ওয়েগনার আগের রাত্রেই নিউ আর্লিয়েন্সে চলে গেছে। চারদিন বাদে ফিরবে।

মার্গারিট কিন্তু একটুও নিরাশ হলো না। বললো.—দাঁড়াও. আমি আর এক জায়গায় ঘুরে আসছি। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এলো ছ'শো ডলার হাতে নিয়ে।

—কোথা থেকে পেলে?—ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে এলাম।—দিল?—দেবে না কেন? আমি জোর দিয়ে বললাম. আমার খুব দরকার. আমাকে যদি এখন না দাও তাহলে ব্যাংক খুলে বসেছো কেন?

আশ্চর্য এখানকার ব্যাংক। যে-মেয়েটি এদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে. তাকেও টাকা ধার দেয়! মেয়েটি তো কোনো কারণে আর এদেশে না ফিরতেও পারে! সম্ভবত ওর সরল সুন্দর মুখের দাবি ওরা উপেক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য. এদেশের ব্যাংকগুলোর কাছে পাঁচ-ছ'শো ডলার নিতান্ত খোলামকুচি।

পরদিন ভোরবেলা মার্গারিটের প্লেন। পাছে ঠিক সময় আমরা উঠতে না পারি. তাই সারা রাত জেগে রইলাম। গত সাত-আট মাসের মধ্যে আমরা তিন-চার দিনের বেশী পরস্পরকে ছেড়ে থাকিনি। এবার মার্গারিট ক'দিনের জন্য যাচ্ছে তার কোনো ঠিক নেই। ওর মা-কে একটু সুস্থ দেখলেই চলে আসবে! কিন্তু ওর মায়ের যদি কিছু একটা হয়ে যায়? আমরা মুখে কেউই সে-কথা

বলছি না। ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। দু'জনেই যেন দু'জনকে খুশী রাখার চেষ্টায় নানারকম মজার মজার কথা বলতে লাগলাম। ও আমাকে শোনালো ত্রিস্তান অর ইসল্টের কাহিনীর সাত আট রকম ভাষ্য। আমি ওকে শোনালাম বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। অন্য আলো নিভিয়ে একটা বড় লাল রঙের মোমবাতি জ্বালা হয়েছে, সঙ্গে এক বোতল কোনিয়াক। যখন রাত ভোর হয়ে গেল, তখন মোমবাতি কিংবা কোনিয়াকের বোতল—কোনটাই শেষ হয়নি। ওর কোলে আমার মাথা। ও মুখটা নিচু করে শেষবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, 'এবার চলো।'

ঠিক সময় পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। টাকা-পয়সা একেবারে টায়-টায়। আমার কোনো অসুবিধে নেই, ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, তিন দিন বাদে পল এলেই আমি টাকা পেয়ে যাবো। কিন্তু ফ্লাইটের কোনো গোলমাল হলে মার্গারিট বিপদে পড়ে যাবে। তবু সেই টাকা থেকেই দেড় ডলার খরচ করে এয়ার ইন্সিওরেন্স করে ফেললো। সেই কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললো, 'নাও, আমি যদি মরি, তাহলেই তুমি কুড়ি হাজার ডলার পেয়ে যাবে।'

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। এই মেয়ের প্রাণের দাম মাত্র কুড়ি হাজার ডলার! আমি তো এর বিনিময়ে বলিরাজার মতন স্বর্গ মর্ত্যও দান করতে পারি। কিন্তু প্লেনটা আকাশে উড়ে যাবার পর আমার মনে হলো, সত্যিই যদি কিছু হয়, তা হলে কুড়ি হাজার ডলার আমার হাতে এসে যাবে? সে যে অনেক টাকা! বিমান দুর্ঘটনা তো যখন-তখন হয়! পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আমি মার্গারিটের মৃত্যু কামনা করছি? মানুষের মন এরকম সাঙ্ঘাতিক হয়! হাতের সেই কাগজটাকে মনে হলো ফণা তোলা সাপ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

মার্গারিট চলে যাবার পর কিন্তু নিজেকে অনেকটা স্বাধীন মনে হলো। এতদিন ওর সততা ও নীতিবোধের জন্য আমিও অনেকখানি আটকে ছিলাম। যখন-তখন যা খুশী করতে পারিনি! একথা ঠিক, ওর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা না হলে আমি অনেক বখে যেতে পারতাম। যে-দেশে নারী এবং সুরা এত সুলভ, সেখানে আমি ডুবে যেতে পারতাম সহজেই। আমার তো কোনো দায় নেই। আমি পাপ-পুণ্যের জন্য কারুর কাছে দস্তখত দিইনি। কাজে ডুবে থাকতে না পারলে আমার মধ্যে দারুণ একটা অস্থিরতা জাগে। এখন আমি স্বাধীন, আমি যা খুশী করতে পারি।

দু' তিন দিন বাদেই বুঝলাম, মানুষ সব সময় সব রকম স্বাধীনতাও চায় না। মার্গারিট নেই বলে কিছু ভালো লাগে না। আমার ঘরটাকে শূন্য আর ঠান্ডা মনে হয়। সব জায়গায় ছড়ানো আছে ওর চিহ্ন। ওর রুমাল, ওর স্কার্ফ ওর চটি। আমার গায়ে ওর কিনে দেওয়া ড্রেসিং গাউন। চিঠি লেখার

কাগজও ও কিনে এনেছে। রান্নাঘরের প্রতিটি জিনিসে ওর স্পর্শ। দূর ছাই, কে আর রান্না করে!

টেবলের ওপর ওর টাইপ রাইটার। কিছুদিন ধরে এটা আমিই ব্যবহার করছি। মনে পড়ছে, একদিন ও আমার একটা ইংরিজি বাক্যের ভুল ধরেছিল! আমি চটে উঠে বলেছিলাম—তুমি ফরাসী, তুমি ইংরিজির কি জানো? বলেছিল—যাও, যাও, তোমার চেয়ে অনেক ভালো জানি! আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম না? তুমি জানো, কখন প্রপোজাল আর কখন প্রপোজিশান হয়? হিউমিলিটি আর হিউমিলিয়েশনের তফাত জানো? আমাদের মধ্যে ঝগড়াটাই ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। আমি কখনো খুব রেগে উঠলেই মার্গারিট হাসতে হাসতে একেবারে ভেঙে পড়তো, ওর শরীরে যেন রাগ জিনিসটাই নেই। আমাকে বলতো—ইউ লুক লাইক অ্যান অ্যাংরি গড্। ওল্ড টেস্টামেণ্টের গডের মতন...

কয়েকদিন পরেই আমার একাকীত্ব আরো অসহ্য হয়ে উঠলো। প্রথম দিকের একাকীত্বের চেয়ে এটা আরও অনেক বেশী তীব্র। তখন পাবে আবার আড্ডা দিতে যেতে লাগলাম। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়। গ্যালন গ্যালন বীয়ার খেয়েই নেশা হয়ে যায়। গাঁজাও চলছে অনেকের মধ্যে। আমি ভারতীয় বলে কেউ কেউ ভাবে, গাঁজা সাজার ব্যাপারে আমার বুঝি জন্মগত জ্ঞান আছে। দু' আঙুলের ফাঁকে গাঁজা ভর্তি সিগারেটটা কল্কের মতন ধরে হুস করে টান দিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দিই।

ডোরির সঙ্গেও এখানে দেখা হতে লাগলো। একদিন দেখলাম লিন্ডাকেও। লিন্ডা বেঁচে উঠেছে, কিন্তু চোখ দুটি সম্পূর্ণ অন্ধ। একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে তার, তখন সে পাবে আসতে পারে। কিন্তু এর ভেতরটা কী রকম, তা আর ওর দেখা হলো না!

একদিন সন্ধ্যের পর পাব থেকে বেরিয়ে ডোরি বললো, 'চলো আমরা সবাই এখন আণ্টি আইমারের জয়েণ্টে যাচ্ছি, তুমি যাবে?'

বললাম, 'চলো!'

ডোরির সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণ থাকে এখন একটি অস্ট্রেলিয়ান ছেলে। ওর স্ট্যাম্প অ্যালবামে নতুন স্ট্যাম্প। সে আজ নেই। আমরা সাত-আট জন ছেলে-মেয়ে মিলে হাজির হলাম আণ্টি আইমারের বাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে, ডে ময়েনের দিকে যেতে রাস্তার ওপর ফাঁকা জায়গায় একলা একটা বাড়ি। আণ্টি আইমারের বয়েস কিন্তু বেশী নয়। তিরিশ-বত্রিশ মাত্র, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। এসেই বুঝলাম, এখানে ছেলেমেয়েরা গ্রুপ সেক্স এবং নানারকম নেশা করতে আসে। এটা অবশ্য আণ্টি আইমারের পেশা নয়, টাকা-পয়সা নেয় না কারুর কাছ থেকে, বরং নিজেই অনেক খরচ করে, এটা তার শখ। হলঘরের মধ্যে একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের বিরাট ছবি মালা দিয়ে

সাজানো, পাশে অনেকগুলো ধূপ গোঁজা। সে নাকি কোন্ যোগী। তিনটে ছেলেমেয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে, তারা এল এস ডি খেয়েছে, পোষাকের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অন্যরা যার যেখানে খুশী বসে গেল, এ ওর গায়ের ওপর, গাঁজার কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল। কে যে কি কথা বলছে, সকলের চেঁচামেচিতে তার কিছুই বোঝা যায় না। এর মধ্যে আবার কে একটা ক্যানকেনে আওয়াজের রেকর্ড চালিয়ে দিল।

আন্টি আইমার আমার পাশে বসে বিনা আলাপেই মিষ্টি করে বললো, 'তুমি কি নেবে, ডার্লিং?'

অন্য নেশাফেসা আমার তেমন পছন্দ হয় না। বললাম, 'কোনোরকম অ্যালকোহল আছে?'

এক বোতল স্কচ আর একটা লম্বা গেলাস নিয়ে এসে সে বললো— হেল্প ইয়োর সেল্ফ!

আমি চুক চুক করে সেই স্কচ খেতে খেতে ওদের দেখতে লাগলাম। খারাপ লাগে না। এর মধ্যে যৌবনের দুরন্তপনার একটা ছবি আছে। আমি জানি, এদের মধ্যে কয়েকজন পড়াশুনোয় সাংঘাতিক ভালো, চাষ করার সময় মাঠে গিয়ে দারুণ পরিশ্রম করতে পারে—পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় এদের নিয়ে ছেড়ে দিলেও ভয় পাবে না!

বুঝতে পারছি, বেশ নেশা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? নিজের সেই নির্জন ঠাণ্ডা ঘরটায় ফিরতে ইচ্ছে করে না কিছুতেই। এখানে নেশায় মাটিতে গড়িয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। আন্টি আইমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একজনের সঙ্গে নাচ শুরু করেছে, যাদের জ্ঞান আছে এখনো, তারা হাততালি দিচ্ছে।

ফ্রিজ থেকে খানিকটা বরফ আনবার জন্য আমি উঠে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ডোরি। ওরও বেশ নেশা হয়েছে। চোখ দুটি চকচকে, ধারালো নাকটি দামাস্কাসের ছুরির মতন খাড়া হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কেমন লাগছে?'

জড়ানো গলায় বললাম—গ্রেট! এভরিথিং ইজ গ্রেট!

ডোরি ওর ডান হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বললো, 'এখানে একটা চুমু দাও।'

ঐ জায়গাটা যে চুমু খাওয়ার পক্ষে একটা আদর্শস্থান, এটা আর কারুকে বলতে শুনিনি। ওকে খুশী করার জন্য সম্পূর্ণ আলিঙ্গন করে সেখানে একটা চুমু দিলাম। ডোরি খিলখিল করে হেসে উঠলো। ওর বগলে পাউডার, সেণ্ট আর ওর ঘামের গন্ধে আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো! আমি চোখ বড় বড় করে ডোরির দিকে তাকালাম। ওর বুকের জামাটা এতখানি কাটা

যে সবই দেখা যায়। সেখানে আমার মুখ নামাতেই ও বললো, ‘এসো—।’

হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলো পাশের ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডোরির পোষাকটা খুলে ফেলা অত্যন্ত সহজ কাজ, কেননা সব কিছুই প্রায়-খোলা, তবু আমি এমন টানাটানি করতে লাগলাম যেন ছিঁড়েই যাবে: ডোরি শুধু খিলখিল করে হাসছে। ওর শরীরটা দারুণ উত্তপ্ত। আমি পাগলের মতন ঝুঁকে পড়লাম ওর ওপরে, ওর চোখের দিকে চোখ গেল, যেন নীল আলো বেরুচ্ছে...

সামনেই একটা ড্রেসিং টেবলের আয়না। তাতে আমার মুখটা দেখলাম। এ কে? এ কি সেই আমি? আমার মুখখানা একটা জন্তুর মতন দেখাচ্ছে। আমি ডোরির বুকের ওপর শুয়ে আছি। এই জন্যই মার্গারিট বলেছিল, চট্ করে ভালোবাসার কথা বলতে নেই। ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অনেক রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছোতে হয় ভালোবাসার কাছে। ঠিকই বলেছিল মার্গারিট। আমি পারলাম না, আমি হেরে যাচ্ছি।

ডোরি ঠাস করে আমার গালে এক চড় মেরে বললো, ‘ব্লাড়ি ফুল! তুমি অন্য কারুর কথা ভাবছো।’

আমি ওকে এক ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিলাম। ডোরি আঁচড়ে কামড়ে এবং গালাগাল দিয়ে আমার প্রায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চাইলো। এক সময় দেখলাম আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। উঠে বেসিনে রক্ত ধুতে গেলাম—ডোরি হা-হা করে হাসতে লাগলো। সেই হাসি শুনলে ভয় হয়। বেসিনের আরসির দিকে তাকিয়ে বললাম—মার্গারিট, আমাকে ক্ষমা করবে?

বাড়ি ফিরে চুপ করে বসে রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিছানায় নয়, চেয়ারে নয়, ঘরের মেঝেতে, এক কোণে। মাথাটা এখনো পরিষ্কার নয়। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় দুঃখবোধ অনেক তীব্র হয়। আমার কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। নিজেকে শাস্তি দিলাম, ঘর থেকে আর একদম বেরুবো না।

বেরুলাম না বেশ কয়েকদিন। কিন্তু এই রকমভাবে কতদিন থাকা যায়! ঘরের মধ্যে মার্গারিটের স্মৃতি, বাইরে নানারকম প্রলোভন। আমাকে বাঁচতে হবে তো!

মার্গারিটের চিঠি আসছে প্রায় প্রত্যেকদিন। ওর মায়ের সত্যিই খুব অসুখ। কবে আসতে পারবে ঠিক নেই। ফ্রান্সের আবহাওয়া এখন যা সুন্দর! কেন আমি ওর কাছে এখন নেই!

মার্গারিট জানে, আমার চিঠি লেখার অভ্যেস খুব কম। তাই প্রতি চিঠিতেই লেখে, শোনো নীল, তোমাকে সব চিঠির উত্তর দিতে হবে না। তুমি সপ্তাহে একটা অন্তত ছোট্ট চিঠি লিখো আমাকে। পারবে তো? একা একা রান্না করে খেয়ো না! দোকান থেকেই কিছু কিনে নিও! আমাদের

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক আমেরিকা ঘুরে এসে কি বলেছিলেন জানো? ও দেশটা সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা যায়, ওদের মাংসের কোয়ালিটি বেশ ভালো!

না-পড়া বইগুলো শেষ করি এখন। অনেক বই মার্গারিটের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ার কথা ছিল। রেকর্ড প্লেয়ারে এখনো চাপানো আছে ইভ্ মতাঁর গান, ফিউমে ল্য সিগার—মার্গারিট যাওয়ার আগের দিন দু'জনে মিলে শুনেছিলাম। তার নিচে এদিথ্ পিয়াফ। বাক্সের ওপর রাখা আছে আমার সংগ্রহ করা রবিশঙ্কর, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়তে পড়তে যখন চোখ জ্বালা করে, তখন একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসি। কখনো একা একা নাচি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলায় গালাগাল দিই বিশ্ব-সংসারকে। তারপর এক সময় খুব নেশা হলে ঘুমিয়ে পড়ি আপনিই।

দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও আমি ফেল করলাম। শনিবার অনেক রাত্রে আমার বাড়ির সিঁড়িতেই একটা কান্নার আওয়াজ শুনলাম। বাড়ির সব ছেলে-মেয়েই আজ ডেটিং করতে গেছে, এমনকি ক্রিস্তফও গেছে একটা জাপানী মেয়ের সঙ্গে। এখন সিঁড়িতে কে কাঁদে? বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কারুর থাকার কথা নয়। বেরিয়ে এসে দেখলাম, সিঁড়ির ওপর বসে আছে তিনতলার মেয়েটি, সম্পূর্ণ নগ্ন। যাওয়া-আসার পথে সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দু' একবার 'হাই' 'হাই' হয়েছে মাত্র। মেয়েটি লম্বা আর চওড়ায় এত বড় যে একটি ছোটখাটো মেয়ে-দৈত্য বলে মনে হয়, যদিও বয়েস বেশী নয়। এ রকম চেহারার জন্য ওর বিশেষ ছেলেবন্ধু হয় না। কোনো ছেলেই নিজের থেকে বেশী লম্বা কোনো মেয়ের পাশে হাঁটতে ভালোবাসে না

কিন্তু মেয়েটি এই সময় এই অবস্থায় বসে কাঁদছে কেন? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বার্বারা, কি হয়েছে তোমার?'

বার্বারা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে কাঁদছে। একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, তারপর বললো—দ্যাট্স নান অব ইয়োর ড্যাম বিজনেস!

মেয়েটি একদম মাতাল। আমার নিজেরও তখন বেশ নেশা, তবু মনে হলো, একে এর ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত। পরোপকার করা মানুষের নেশা। একা কোনো মেয়েকে দেখলে মানুষ আরও বেশী পরোপকারী হয়ে ওঠে।

আমি ওর হাত ধরে বললাম—কাম অন্ বেবী! চলো ঘরে চলো—

বার্বারা ঘ্যাঁক করে আমার হাতে কামড়ে দিল। উ হু হু হু করে আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। এ তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে দেখছি! কিন্তু যে-রকম ভাবে দুলছে, যে-কোনো সময় সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। ওর পাশে বসে খুব নরম গলায় বললাম, 'এ কি করছো? লোকজন এসে পড়বে। তোমার

মতন নাইস, ডিসেণ্ট গার্ল—।'

বার্বারা কান্না থামিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো—ইউ ওয়াণ্ট টু হ্যাভ মী?

হ্যাভ কথাটার কতরকম মানে হয়। আমি যদিও পৃথিবীর হ্যাভ নট্‌স-দের দলে, তবু এখানে এই সহজতম বাক্যটি শুনে আমার সারা গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। বার্বারার দ্বিগুণ আকারের শরীর, অথচ বেঢপ নয় সুগঠিত বুক ও উরু—আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলাম।

আমার দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'ঐটা তোমার ঘর?'

—হ্যাঁ।

—চলো, ওখানে যাবো। আমার ঘরে যাবো না! এক সান অব আ বীচ্ এসে জলটল ফেলে, বোতল ভেঙে আমার ঘর একেবারে নোংরা করে দিয়ে গেছে। আর যাবো না ওখানে। তোমার ঘরে চলো—

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো—গেট মি, লাভার বয়!

দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুলতেই ও আমার বুকের ওপর এসে পড়লো। আদিম মানবী। ও এখন একটাই জিনিস চায়। আমিও তো এই পৃথিবীর আদিবাসী। তবে আর আমার দ্বিধা থাকবে কেন? আমি এখন একা, বার্বারাও একা। আমার হাতটা দিয়ে ওর কোমর জড়ালো, তারপর নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো—হোল্ড মী টাইট!

প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল আমার। তবু দরজার সামনে এসে থেমে গেলাম। এই ঘরে ! মার্গারিটের এত স্মৃতিমাখা এই ঘরে কাকে নিয়ে যাচ্ছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মার্গারিট নেই বলে বার্বারা নামের এই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে? তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম—সরি! এখানে হবে না। দেয়ার ইজ অ্যানাদার গার্ল ইন্ দেয়ার!

মাতাল অবস্থাতেও বার্বারা এ কথাটার মানে বুঝলো। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রাণভরে গালাগাল দিতে লাগলো—ইউ ডার্টি ডাব্‌ল ক্রসার! ব্লাডি স্কাঙ্ক! ব্যাসটার্ড! নীগার্!

ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলাম। সিঁড়িতে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে বার্বারা! আমি তো ওর উপকারই করেছি। আমি মিথ্যে কথা বললেও, ও তো সিঁড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তবে আমি হাঁপাচ্ছি কেন? আমি দুর্বল, আমি ভীষণ ভীষণ দুর্বল। এক হাতে মাথার চুল খিমচে ধরলাম। অন্য হাতে সেতারের কানের মতন নিজের কান এমন মোচড়াতে লাগলাম যাতে তার-টার সব ছিঁড়ে যায়।

পরদিন সকালে মার্গারিটের চিঠি এলো। মায়ের অসুখ অনেকটা

ভালো। তবে এখন তো গ্রীষ্ম এসে গেল, শিগগিরই ছুটি পড়বে। সবাই আমাকে বলছে, এক্ষুনি ফিরে কি হবে? আরও একমাস দেড়মাস থেকে যেতে। এরা তো কেউ বুঝবে না আমি কেন ফেরার জন্য ব্যস্ত! আমার একটা দিনও এখানে থাকতে আর ইচ্ছে করে না! তোমাকে কতদিন যেন দেখিনি, যেন কত যুগ...। মা হাসপাতাল থেকে না এলে ফেরা যাবে না। বোনরা ছাড়ছে না কিছুতেই। তবে দু'-একদিনের মধ্যেই একবার পারী যাচ্ছি। ইস, তুমি যদি একবার আসতে পারতে! আমার বন্ধু মোনিক-এর ফ্ল্যাট আছে, থাকার জায়গার কোনো অসুবিধে ছিল না! ইস, এই যা একখানা সুযোগ না! তুমি একবার আসতে পারো না? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করো না! আমরা ফিরে গিয়ে সব শোধ করে দেবো। দুজনেই বেবী সিট্ করবো রোজ রোজ, ঠিক শোধ হয়ে যাবে। আসবে না? কতদিন দেখিনি।

তৎক্ষণাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। সেই ফর্মটা আজও ফিল-আপ করা হয়নি। সেদিনই পল ওয়েগনারের কাছে সেটা ফেরত দিয়ে বললাম, 'আর দরকার নেই। আমি আর থাকবো না!'

পল ওয়েগনার যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। চোখ বড় বড় করে বললো, 'কি বলছো তুমি!'

—তুমি যে বলেছিলে আমি যে-কোনো সময় ফিরে যেতে পারি?

—তা তো পারোই। কেউ তোমায় আটকাচ্ছে না! কিন্তু কেন ফিরে যাবে? কোনো অসুবিধে হচ্ছে? আমায় খুলে বলো। এখনো এত রকম সুযোগ রয়েছে, অনেক রকম কাজ করতে পারো।

কিন্তু আমার বাঙালের গোঁ। একবার যখন ফিরবো ঠিক করেছি, আর মত বদলাবো না কিছুতেই।

অন্য কাউকে কিছু বললাম না। চুপি চুপি ব্যবস্থা করে ফেললাম সব। কারুর কাছে কোনো ধার-টার আছে কিনা। কোথাও কোনো কাগজপত্রে সই করা বাকি আছে কিনা। আমার একটা ভালো ইস্ত্রি ছিল, যাতে উল, টেরিলিন বা সুতির জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য ইচ্ছে মতন্ উত্তাপ কমানো বাড়ানো যায়—ক্রিস্তফ সেটা মাঝে মাঝে ধার নিত। ওকে বললাম 'ওটা তুমিই রেখে দাও, আমার আর লাগবে না।'

ও অবাক হয়ে বললো, 'কেন, লাগবে না কেন? তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

আমি সাবধান হয়ে গেলাম। বললাম, 'না, না, আমি এই কিছুদিনের জন্য একটু নিউ ইয়র্ক থেকে ঘুরে আসছি।'

ক্রিস্তফ নিজেকে আমার অভিভাবক মনে করে। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না, কেন আমি এত তাড়াতাড়ি এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

মার্গারিটকে সংক্ষেপে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম, আমার জন্য প্যারিসে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

এয়ারপোর্টে এসেও পল ওয়েগনার আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, 'নীল-লোহিত, এখন বলো, তুমি থাকতে চাও কিনা! এখনো সব ব্যবস্থা করা যায়। টিকিট ক্যানসেল করা যায়!'

আমি ভারী গলায় বললাম, 'না, পল, তা আর হয় না। তোমার দেশ খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। আমার কাজ আমার নিজের দেশে! সব কিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিদায়!'

॥ ১১ ॥

প্যারিসে পেঁছে দেখলাম, সমস্ত দেয়ালে দেয়ালে আমার নাম। বিরাট বিরাট পোস্টারে লেখা, নীল! নীল! যেন গোটা শহর আমাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। যখনকার কথা বলছি, তখনও আমার নামেরই আর একজন, প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পা দেয়নি। সুতরাং তার জন্য এ অভ্যর্থনা হতে পারে না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওটা একটা নতুন বেরুনো সাবানের বিজ্ঞাপন।

এয়ারপোর্ট থেকে বাস নিয়ে শহরের মধ্যে এয়ার টার্মিনালে পেঁছেই দেখি মার্গারিট দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে একেবারে হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলো। সত্যিই যেন এক যুগ পরে দেখা। অথচ মাত্র দেড় মাস। তারপর বকুনি দিয়ে বললো তুমি কি কিপ্টে হয়ে গেছ, এয়ারপোর্ট থেকে বাসে এলে? ট্যাক্সি নিতে পারোনি? আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি! ওকে আর কি করে বলবো যে এখানকার ফ্রাঁ-এর হিসেব আমি এখনো বুঝিনি! ফরাসী দেশের মতন এমন মজার টাকা বোধহয় আর কোনো দেশে নেই। আর কোন্ দেশে নোটের ওপর শিল্পী, সাহিত্যিকদের বড় বড় ছবি ছাপা থাকে!

একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম প্লাস পিগাল। এটা প্রধানত টুরিস্টদের পাড়া, হোটেলের দাম গলা-কাটা। বড় বড় নাইট ক্লাব আর ফটোগ্রাফির দোকান। যার যত খুশী অসভ্য ছবি কিনতে পারে এ পাড়ায়।

আমরা এসে থামলাম বিশ্ববিখ্যাত নাইট ক্লাব মুল্যাঁ রুজের সামনে। মেঘলা মেঘলা দুপুর. এখন তো কেউ নাইট ক্লাবে যায় না। মার্গারিট বললো, 'এসোই না!'

মুল্যাঁ রুজ যে বাড়িটার অংশ, সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি। প্রধান দরজার কাছে এসে মার্গারিট বাড়ির কঁসিয়ার্জের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। প্যারিসের কঁসিয়ার্জদের কথা আগে অনেক শুনেছি, এঁদের নেকনজর ছাড়া বাড়িতে ঢোকা-বেরুনোর উপায় নেই। এ বাড়ির ইনি একটি মোটাসোটা মহিলা। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অ্যালজিরিয়ান?

হা কপাল! ভারতীয়দের কেউ চেনে না। ভারত নামের দেশটার কথা সব সময় মনেই থাকে না এদের।

লিফ্‌ট দিয়ে তিনতলায় উঠে এলাম। তারপরও বিরাট বারান্দা দিয়ে এতখানি হাঁটতে হলো, যেন রেড রোডের এপার ওপার। একেবারে শেষ প্রান্তে

এসে মার্গারিট চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে বললো, 'এটা এখন শুধু আমাদের।'

ফ্ল্যাটটা একদম খালি। বড় বড় তিনখানা ঘর। নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হবে, তাও ফরাসী ভাষায়, এই ভেবে মনে মনে আমি শঙ্কিত ছিলাম। এখন সেই জড়তাটা কেটে গেল। আনন্দের চোটে মার্গারিটকে কোলে তুলে নিয়ে এক পাক ঘুরে গিয়ে বললাম, 'হুর্‌রে! একদম খালি! এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!'

দেড় মাসের পাওনা সব ক'টি চুমু ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বন্ধু মোনিক কোথায়?'

—সে তো অফিসে। সে খুব সকালে বেরিয়ে যায়। শোন, মোনিক তোমাকে বিঁয়াভনু (স্বাগতম) করে গেছে, তোমার জন্য একটা সুইট ডিস বানিয়ে রেখে গেছে।

—এত বড় ফ্ল্যাটে মোনিক একা থাকেন? এটা তো খুব খরচের শহর শুনেছি।

—এটা ছিল আগে আমার বন্ধু এলেনের। এলেনই আমার আসল বন্ধু, যার সঙ্গে আমি পারীতে পড়তে এসেছিলাম—কালও দেখা হলো ওর সঙ্গে. তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো—

—এলেন ছেলে না মেয়ে?

মার্গারিট শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'যদি বলি ছেলে? তোমার হিংসে হবে?'

—নিশ্চয়ই!

—বলেছিলাম না, তুমি ওল্ড টেস্টামেন্টের গডের মতন, যেমন অ্যাংরি. তেমনি জেলাসও বটে!

পরে জেনেছিলাম, এলেন আসলে. বাংলা বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি হেলেন। ফরাসীরা তো হ উচ্চারণ করবে না কিছুতেই!

এলেন আর মোনিক্‌ আগে এক সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকতো। এলেন বিয়ে করে অন্য জায়গায় উঠে গেছে। মোনিক্‌ যদি শিগগির বিয়ে না করে. তাহলে সেও এটা ছেড়ে দেবে। বিয়ে করবে কিনা. সে সম্পর্কে মোনিক্‌ মত স্থির করতে পারছে না।

দুপুরবেলা এত বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সবাই কাজে বেরিয়ে যায়। মনে হয় যেন বাহান্নখানা অ্যাপার্টমেন্টওয়ালা এই পেল্লায় বাড়িটায় আমি আর মার্গারিটই শুধু দুটি মাত্র প্রাণী।

চট করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বিশ্রম্ভালাপ শুরু করলাম। মার্গারিট ওর মায়ের তৈরি দু' বোতল ওয়াইন নিয়ে এসেছে। পূর্ববঙ্গে যেমন বাড়ির

তৈরি কাসুন্দি অন্যান্য বাড়িতে উপহার পাঠানো হয়, ফ্রান্সে সেই রকম বাড়ির তৈরি ওয়াইন। একটু চেখে বলেছিলাম—মার্গারিট, সত্যি অপূর্ব এমন কখনো আগে খাইনি। কী মিষ্টি তোমার মায়ের হাত।

মায়ের প্রশংসায় ছেলেমানুষের মতন খুশী হয়ে বললো, 'জানো তো, মাকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম!'

—কি বললেন তিনি!

—মা বললেন, নিয়ে এলি না কেন? আমি কখনো কোনো হিন্দু দেখিনি!

ভারতের যে-কোনো লোকই এদের কাছে হিন্দু। সেই হিসেবে আমার নিজেকে খুব একটা দ্রষ্টব্য মনে হলো না।

আমি বললাম, 'মার্গারিট, তুমি যতদিন ছিলে না, আমি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম।'

—তুমি কতটা খারাপ হতে পারো?

—অনেক অনেক খারাপ!

—তুমি যখন খারাপ হও, সেই অবস্থায় তোমাকে আমার একটু দেখতে ইচ্ছে করে! তোমার খারাপ হবার ক্ষমতাই নেই। তুমি খারাপের ডেফিনিশান জানো না!

—কি পাগল! তুমি আমাকে এতটা বিশ্বাস করো!

—শোনো নীল, ওখানে এই ক'দিন আমার কথা তোমার মনে পড়তো?

—প্রতিদিন, প্রত্যেক ঘণ্টায় মনে পড়তো। বিশ্বাস করো, তুমি ছিলে না বলে আমার এক মুহূর্তও ভালো লাগে নি! আমার ঘরটাকে কী রকম বিচ্ছিরি আর ফাঁকা মনে হতো...বব বাকল্যান্ডের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন দু' একবার গেছি, তাকাতে পারিনি বাড়িটার দিকে...

—আমিও এখানে, তোমাকে ছেড়ে এসে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারিনি। মায়ের অসুখ। তার খাটের পাশে বসেও আমি তোমার কথা ভেবেছি।

এর পরে আমার মুখে আর একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। তবু আমি চুপ করে রইলাম। মার্গারিট আমার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই তা বুঝে গেল। চোখ নামিয়ে বললো, 'আমি তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালোবাসতে চাই। আমি এখনো বুঝিনি ভালোবাসা কাকে বলে, কিন্তু আমি ভালোবাসতে চাই। সেই রকম ভালোবাসা—যা মানুষের জীবন থেকে আর কখনো ছাড়ে না। আমি এবার এসে বাইবেল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, ভালোবাসা কাকে বলে, তা জানার জন্য। কেউ বলতে পারেনি। আমি জানি, এর উত্তর আছে শুধু মানুষের মনে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খুব শিগগিরই এর উত্তর পেয়ে যাবো!'

আমি বললাম, 'মার্গারিট, সারা ইওরোপ আমেরিকায় তুমিই বোধহয়

এখন একমাত্র মেয়ে, যে ভালোবাসা নিয়ে এরকম চিন্তা করছে। আর কেউ করে না। সবাই এখন বোঝে সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ভালোবাসা নিয়ে কে মাথা ঘামায়! এ পর্যন্ত যতজনকে দেখলাম—'

মার্গারিট উত্তেজিতভাবে বললো, 'না, না, তা হতে পারে না! এ তো প্রিমিটিভ! একদম প্রিমিটিভ। শুধু সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং—এ প্রিমিটিভ ছাড়া কি! ভালোবাসা ছাড়া মানুষের সভ্যতা বাঁচতে পারে না!'

বিকেলবেলা মোনিকের সঙ্গে আলাপ হলো। কালো সিল্কের গাউন-পরা শ্বেতপাথরের এক মূর্তি যেন। মার্গারিটেরই মতন ছিপছিপে তন্বী, তবে ভুরু আঁকে এবং সাজগোজের দিকে বেশ নজর আছে। প্রথম আলাপে তাকে একটু গম্ভীর মনে হয়, আসলে তার একটা চাপা রসিকতা বোধ আছে। ফরাসী ছাড়া ইংরেজিতে সে এক অক্ষরও কথা বলবে না, আমি বুঝতে না পারলে আবার বলবে—না, না, মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করো না, পেতি লারুস্ দেখো। ফরাসী ভাষায় বেশ মোটাসোটা একটা বিখ্যাত অভিধানের নাম পেতি লারুস্। ঐ যদি পেতি লারুসের চেহারা হয়, তা হলে গ্রাঁ লারুস্ কী রকম দেখতে হবে কে জানে!

মোনিক্ এসেছে বোর্দো অঞ্চল থেকে। শহরে একা চাকরি করে। এই জিনিসটা আমরা এখনো দেখিনি, একলা একলা মেয়েরা গ্রাম থেকে শহরে চাকরি করতে আসে এবং নিজস্ব অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। মোনিক্ও অনেক কবিতা মুখস্ত বলতে পারে বটে, কিন্তু তার স্বভাব মার্গারিটের একদম বিপরীত। একদিন সে তার এক ইটালীয়ান ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল, কিছুক্ষণ একসঙ্গে গল্প ও মদ্যপানের পর সে তার ছেলে-বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। কিছুদিন আগেই নাকি তার এক জার্মান বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেও এরকম দরজায় খিল দিয়েছে। সে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। সে বিশ্বাস করে সিলেকশানে।

আমাদের কাছে আলাদা চাবি আছে, আমরা ইচ্ছে মতন যখন খুশী আসবো—যাবো, যখন ইচ্ছে খেয়ে নেবো—মোনিক্ বলেছে তার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট করার কোনো দরকার নেই।

আমরা সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। নতুন লোকের পক্ষে প্যারিসের রাস্তা চিনতেই অনেক সময় যায়। আমার সে সমস্যা নেই। মার্গারিট একদিনেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, কি করে মাটির তলায় নেমে এক জায়গায় বোতাম টিপে আলো জ্বাললেই মেত্রো রেলের সব জায়গার রুট জানা যায়। এর মধ্যে ঘুরে এলাম ভার্সাই। লুভ্র মিউজিয়াম দেখতেই দুদিন কেটে গেল। আলাদা আলাদা আর্টগ্যালারিতে আলাদা আর্টিস্টদের একক প্রদর্শনীর

খবর মার্গারিট জোগাড় করে আনে। রুয়োর শেষ জীবনের বিপন্ন ম্লান ছবিগুলির একটা প্রদর্শনী দেখে এক সন্ধ্যে মন খারাপ হয়েই রইলো।

কখনো ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলে সাঁজেলিজে'র কোনো কাফেতে বসি। চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দৃশ্য দেখতেই ভালো লাগে। প্যারিসের সব কিছুর মধ্যেই একটা ছিমছাম সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে। স্যেন নদী তো সামান্য ছোট্ট একটা খালের মতন প্রায়, অথচ তারই ওপর কতগুলো ব্রীজ—এবং প্রত্যেক ব্রজে আলাদা কারুকাজ।

বাড়ির নিচেই মুল্যাঁ রুজ, সেখানে একদিনও যাওয়া হয়নি। অতিবিখ্যাত জায়গাগুলিতে মার্গারিট যেতে চায় না, আমারও আগ্রহ নেই। সেজন্য ইফেল টাওয়ারে ওঠাই হলো না। সকালবেলা মুল্যাঁ রুজের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, ভেতরের চেয়ার-টেবল সব উল্টোনো, মেয়েরা বাইরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে কফি খাচ্ছে, তখনও তাদের গালে একটু একটু রং লেগে। তখন কে বলবে, এই মেয়েরাই রাত্রের মোহিনী, সারা বিশ্বের ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে তুফান তুলে দেয়।

সেই সময়টায় আমি বাজার করতে যাই। শস্তা হবে বলে মঁমার্ত্রের বাজার থেকে ঘোড়ার মাংস কিনে আনি আর লাঠির মতন লম্বা লম্বা শক্ত রুটি। প্যারিসে ভাত খাওয়ার আশা বড় দুরাশা। এখানকার দোকানে ব্যাঙ বিক্রি হতেও দেখি না, যদিও ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনেছিলাম চীনেম্যানরা যেমন আরশোলা খায়, ফরাসীরা সেই রকম ব্যাঙ-খেকো। বরং আমেরিকায় প্রায় সব দোকানেই কাঁচা ব্যাঙের ঠ্যাং বিক্রি হয়। একবার মার্গারিট আর আমি কিনে এনে ভেজে খেয়েছিলাম। মার্গারিটেরও সেই প্রথম ভেক-ভক্ষণ।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার আগে আমরা আর বেরুই না। কারণ বাইরে খাওয়ার দারুণ খরচ। দু'জনে খুনসুটি করে কোথা থেকে যে সময় কেটে যায় বুঝি না! খবর এসেছে যে মার্গারিটের মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন এবং ভালো আছেন। মার্গারিট বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে এসে তারপর আমার সঙ্গেই আমেরিকায় ফিরবে—এই রকম পরিকল্পনা করে প্রায়ই। এই সময় আমি চুপ করে থাকি। এই একটা কথা এ পর্যন্ত ওকে বলা হয়নি। কি করে বলবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

একদিন দুপুরবেলা কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্টের এক বুড়ি দেখা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। ঠিক আমার দিদিমার মতন দেখতে, সেই রকম সৌম্য মুখ, ঠোঁটটা হাসি হাসি। আমার লজ্জা করছিল একটু। মার্গারিট আর আমার তো বিয়ে হয়নি, তবু আমরা একসঙ্গে এখানে থাকি—এই বৃদ্ধামানুষটি যদি পছন্দ না করেন? বৃদ্ধা কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাঙালী শুনে তিনি

বললেন—ও, ফই দ্য বেঙ্গাল! সে তো চার্চের একরকম আলোর নাম। আব একরকম পাখি আছে আমাদের গ্রামে, বেঙ্গালি—ছুঁচোলো ঠোঁট।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দিদিমা, ঐ পাখির উল্লেখ আছে মালার্মের কবিতায়!'

বৃদ্ধা বললেন, 'কি জানি বাপু! আমি কি তোদের এইসব মালার্মে না ফালার্মের কবিতা পড়েছি নাকি! আমরা পড়েছিলাম ভিক্তর যুগোর কবিতা, আহা, অমনটি আর হলো না!'

ঠিক যেন আমার দিদিমার মুখে কাশীরাম দাসের প্রশংসা।

স্যেনের পাশে পাশে পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা মার্গারিটের এক নেশা। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়। সন্ধে হয়ে আসে। তখন দেখা যায়, নদীর পারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ের অন্তহীন চুমুর প্রদর্শনী। একদিন আমি বললাম, 'মার্গারিট, আমারও এইরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। বেশ সকলের সামনে।'

মার্গারিট মুখ লুকিয়ে বললো, 'আমার লজ্জা করে। এই সব দেখলে কী রকম যেন লাগে!'

অন্য যে-কোনো মেম-যুবতী একথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে। চুমু খেতে লজ্জা, এ আবার কি নতুন রকমের কথা!

একটু থেমে মার্গারিট বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, এসো—একটু অন্ধকার দেখে।'

—না। অন্ধকার নয়। ব্রীজের আলোর নিচে।

—আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

মার্গারিটকে জড়িয়ে ধরে ঠিক অন্যদের কায়দায় ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রাখলাম। মধ্যবয়স্কা পত্নীকে নিয়ে ভ্রমণরত এক ভারতীয় আমাকে দেখে একেবারে আঁতকে উঠলো। ইস্, এই সময় চেনাশুনো বাঙালী কেউ এসে দেখলে যে কী আনন্দই হতো আমার!

মার্গারিট ফিসফিস করে বললো, 'চলো নত্‌র দাম গীর্জায় যাই। ইচ্ছে করেই আর একদম আলাদা থাকব না! এক বাড়িতেই থাকবো সব সময়।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম। মার্গারিটের কাছে এ পর্যন্ত আর কোনো কথা গোপন করিনি। কিন্তু এ কথাটা যে কি করে বলবো!

একটু বাদে মার্গারিট বললো, 'চলো নত্‌র দাম গীর্জায় যাই। ইচ্ছে করেই এখানে তোমাকে এতদিন নিয়ে যাইনি। আজ রবিবার, আজ আমি ভেতরে গিয়ে প্রার্থনা করবো, তুমি ঘুরে ঘুরে দেখবে। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো, আমি আজ জিজ্ঞেস করবো...'

—কিন্তু তোমার ঈশ্বর কি আমার মতন হীদেন এবং নাস্তিকের প্রতি

কোনো দয়া দেখাবেন?

—ঈশ্বর সকলের।

—আমার জন্য নয়।

হাঁটতে হাঁটতে গেলাম নত্‌রদাম গীর্জায়। আমি ঠিকই বলেছিলাম, মার্গারিটের ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ। বহুদিন পর গীর্জাটায় রং করা হচ্ছে বলে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

মার্গারিট দারুণ বিষণ্ণ হয়ে গেছে। ফেরার পথে আর একটাও কথা বলতে পারলো না। আমারও মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে বেশ। এই রোমান ক্যাথলিকদের ভালোবাসার মর্ম বোঝা আমার সাধ্য নয়! আমার আর এই মেয়েটির মধ্যে ঈশ্বর এসে দাঁড়ায় কেন? ঈশ্বরের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

মোনিক্‌ সকালবেলা তার জার্মান বন্ধুর সঙ্গে শহরের বাইরে গেছে, রাত্রে ফিরবে না বলে গেছে। ফ্রিজ থেকে স্যাম্পেনের বোতলটা বার করে রান্না ঘরেই বসে গেলাম। আজ আর কিছুই ভালো লাগছে না, আজ নেশা করতে হবে! মার্গারিট জামা-কাপড় ছেড়ে আসতে দেরি করছে, ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি, ও বিছানায় শুয়ে আছে।

—এই, তুমি শুয়ে আছো কেন? শরীর খারাপ লাগছে? মাথা ধরেছে?

—না, আমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ফিরে গেলাম। সামনে গেলাস নিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা। আমাকে কিছু একটা কাজ করতেই হবে। এই লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমাণ জীবন আর কতদিন?

ঘন্টাখানেক পরে খেয়াল হলো মার্গারিট তখনও আসেনি। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? গেলাস হাতে নিয়ে ডাকতে গেলাম আবার। মার্গারিট চোখ মেলে শুয়ে আছে। গেলাসটা ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'একটু চুমুক দাও তো, লক্ষ্মীটি, মন ভালো হয়ে যাবে।'

গেলাস সরিয়ে দিয়ে মার্গারিট উঠে বসলো। তারপর দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তুমি আমাকে নাও!'

আমি তখনও বুঝতে পারিনি।

ও আবার বললো, 'তুমি যদি আমাকে ভালো না-ও বাসো, যদি কখনো আমাকে ঘৃণাও করো, অন্য মেয়ের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করো, তবু তোমায় আমি ভালোবাসবো। আমি মন থেকে উত্তর পেয়ে গেছি আজ, তোমার চেয়ে আমি আমার মাকে, বাবাকে, এমন-কি ঈশ্বরকেও বেশী ভালোবাসি না। তুমি আমাকে নাও!'

আমার বুকে যেন দুম করে একটা ধাক্কা লাগলো। কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে পারলাম না। গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম পাশে।

মার্গারিট কাছে এসে আমার গা ছুঁয়ে বললো. 'একি, তুমি কোনো কথা

বলছো না কেন?'

আস্তে আস্তে বললাম, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

—আমি নির্বোধ, তাই আমি বুঝতে এত দেরি করেছি।

—না, তা নয়। এতদিন আমি তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম। আজ শুনে বুঝলাম, আমি এর যোগ্য নই! মার্গারিট, তুমি আমাকে ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলে। কিন্তু আমার ধৈর্য নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারিনি। আমরা এক সংগে থাকতে পারবো না। তোমাকে আমেরিকাতে ফিরতেই হবে। আমার আর ফেরার কোনো উপায় নেই।

—তুমি কি সব আজেবাজে কথা বলছো, নীল?

—আমার কথাটা সত্যি না হলেই এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে খুশী হতাম। কিন্তু এটাই কঠিন সত্যি। আমার আর ফেরার উপায় নেই, তুমি আর আমি আর একসংগে থাকতে পারবো না!

মার্গারিট আমার গেলাসের সবটা শ্যাম্পেন একসংগে গলায় ঢেলে দিতেই কয়েকবার বিষম খেলো। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও টলটলে দুটি চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার সংগে ঠাট্টা করছো?'

ওর পাশে বসে পড়ে আমি বললাম, 'না মার্গারিট, ঠাট্টা নয়। নদী পেরিয়ে এসে নৌকোগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা যাকে বলে, আমি তাই করেছি। আমার বাড়ি ফেরার টিকিট ব্যবহার করে আমি এ পর্যন্ত এসেছি। পরের বছরের স্কলারশীপের ফর্মে আমি সই করিনি। ভিসা রিনিউ করিনি। আমার ফেরার ভাড়া নেই। আর আমি ফিরতে চাইলেও ওরা ফিরতে দেবে না এখন।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মার্গারিট ব্যাপারটা বুঝলো। তারপর শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন এরকম করলে? সত্যিই তুমি আর ধৈর্য রাখতে পারোনি?'

—হয়তো তাই। তা ছাড়া আমি আমার নিজস্ব কিছু কাজ করার জন্য ছটফট করছিলাম। ওখানে আমার কিচ্ছু হচ্ছিল না।

—ওদেশে তোমাকে ফিরতে হবে না। তুমি ফ্রান্সেই থাকো। আমি এখানে চাকরি করবো।

—আমি ভিখিরি কিংবা ক্লশার হয়েও থাকতে রাজী আছি। তবু কি আমাকে থাকতে দেবে? বিনা কাজে কোনো বিদেশীকে কি থাকতে দেয়? তাছাড়া তোমায় আমেরিকায় ফিরতেই হবে মার্গারিট!

—কেন? না, আমি যাবো না। দরকার নেই আমার রিসার্চের। তোমাকে আমি এখানে লুকিয়ে রাখবো।

—তোমাকে ফিরতেই হবে মার্গারিট।

মার্গারিট আমেরিকার ব্যাঙ্ক থেকে ধার করেছে। আমি জানি, আত্মবিক্রয়

করতে হলেও ও সেই টাকা শোধ দেবেই। কথার মর্যাদা যে ওর কাছে সাঙ্ঘাতিক।

অনেকক্ষণ আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর মার্গারিট উঠে এসে আমার কোলের ওপর বসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি আর একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভালোবাসার সঙ্গে তো মিলন বা বিচ্ছেদের কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা হচ্ছে ভালোবাসা। আমরা এক সঙ্গে থাকি বা না থাকি, তাতে কি আসে যায়? ভালোবাসা তো ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কিছুই দাবি করে না! ত্রিস্তান আর ইসল্ট কি এক সঙ্গে থেকেছিল? রাধা আর কৃষ্ণ কি এক বাড়িতে থাকতো!'

—তবু ওদের দেখা হতো।

—আমাদেরও দেখা হবে। আমি কোনো না কোনোদিন কালকুত্তায় যাবো ঠিক।

—আমি আবার ফিরে আসবো!

—সে সব তো পরের কথা। আজ রাত্তিরটা আমরা দুঃখ করে কাটাবো কেন? ভালোবাসার জন্য যদি এক মুহূর্তেরও আনন্দ পাই, তাও তো জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে থাকবে!

ওর মাথাভর্তি সোনালি এলোমেলো চুলে আমি হাত রাখলাম। শান্তভাবে আদর করতে লাগলাম ওর সারা মুখে। ও চোখ বুঁজে আছে। আবেগে সারা শরীরটা কাঁপছে। এত নরম, এত সুন্দর এই বালিকাটিকে কি আমি আঘাত দিলাম? নিজেও তো কম আঘাত পাইনি।

আস্তে আস্তে খুলে দিলাম ওর জামা ও স্কার্ট। লাজুকভাবে ও আমার বুকে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন একটা শিশু। চুমুতে ভরিয়ে দিলাম সারা দেহ। আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চট করে রান্নাঘরে চলে গেলাম শ্যাম্পেনের বোতলটা আনতে। ফিরে এসে দেখি ও পিছন দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছে। চমকে উঠলাম। ও যেন মানুষ নয়, একটা ছবি। কোন্ মিউজিয়ামে যেন এই ছবিটা দেখেছি? হ্যাঁ Ingres -এর আঁকা, লা গ্রাঁড ওদালিস্ক। সত্যি সত্যি মার্গারিটের রক্তমাংসের শরীরটা যেন শিল্প হয়ে যায়। ঈষৎ উঁচু করা চিবুক, বুকের ওপর এসে পড়েছে নীলাভ আলো, কাছাকাছিই অন্ধকার—এ যেন অলৌকিক এক দৃশ্য। চোখ ভরে যায়, কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারলাম, ভালোবাসার মধ্যে কতখানি মায়া। এই দেবোপম শরীর দেখেও তো ঠিক লোভ হয় না। মনে হয় যেন একটা পাহাড়ে লুকোনো ঝর্ণা এখানে নিরালায় অবগাহন করি!

আমার বুকের মধ্যে এসে মার্গারিট কাঁপতে লাগলো। যেন একটা পাখি। আমি ওকে কিছু একটা কথা বলতে গেলেও ও আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে

কথা থামিয়ে দেয়। তারপর একটু পরে নিজেই ফিসফিসিয়ে বলে—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি ভালোবাসাকে জেনেছি!

আমাদের বিচ্ছেদের দিন হঠাৎ খুব কাছে চলে এলো। মোনিক্ ফিরে এসেই ঘোষণা করলো, জার্মান ছেলেটিকে সে অবিলম্বে বিয়ে করছে। সুতরাং আর ঐ অ্যাপার্টমেণ্টে আমাদের থাকা চলে না। আর দু'দিনের সময় নিলাম।

মার্গারিট দারুণ উচ্ছল, আর বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই আর মন খারাপ করবে না। সকালবেলা এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মার্গারিট আমার জন্য কিনে নিয়ে এলো একটা আলপাকার উলের দামী সোয়েটার। আমিও চুপি চুপি বেরিয়ে কিনে আনলাম ওর জন্য একটা ফারের কোট। ও খুব রাগারাগি করে বললো—তুমি কি পাগল হয়েছ? এত টাকা কেউ খরচ করে? তোমার এখন কত টাকা দরকার হবে!

আমি বললাম—আহা রে খুকী! তোর বুঝি আর টাকার দরকার হবে না? অতদূরে ফিরবি কি করে?

দুপুরবেলা ও আবার কিনে আনলো আমার জন্য এক জোড়া সিল্কের জামা। এবার আমিও বকলাম খুব। ওর জন্য কিনে আনলাম প্যারিসের শ্রেষ্ঠ পারফিউম। ও বকতে যেতেই আমি বললাম—আমি চাই, এই পারফিউম মেখে আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে শোবে। আমার হুকুম! ও আবার কিনে আনলো একটা ঘড়ি। মার্গারিট নিশ্চয়ই টাকা ধার করছে। ওর কাছে এত টাকা থাকার কথা নয়! তা হলে আমারই বা সর্বস্বান্ত হতে বাধা কি? সাঁজেলিজের শ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয় ওকে খেতে নিয়ে গেলাম। সেখানে দু'জনের ডিনারের বিলে কত লোকের এক মাসের মাইনে হয়ে যায়।

দু'দিন বাদে মার্গারিট যখন আমাকে ওর্লি এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এলো, তখন আমরা দু'জনেই এমন হাসিখুশি গল্পে মেতে রইলাম, যেন দু'একদিনের জন্য আমি কাছাকাছি কোনো জায়গায় যাচ্ছি।

অবশ্য এখন যাচ্ছি কাছাকাছিই। প্রথমে যাবো লণ্ডনে। বাঙালীর ছেলে এদিকে এসে একবার বিলেত ঘুরে বিলেত-ফেরত না হলে কি চলে? ওখানে এক বন্ধু বিমানকে চিঠি লিখে দিয়েছি। পকেটে আমার এখন আছে ঠিক দশ ডলার। বিমান যদি কোনো কারণে এখন লণ্ডনে না থাকে বা এয়ারপোর্টে না আসে. তাহলেই লণ্ডনে গিয়ে আমায় হাবুডুবু খেতে হবে। ঠিক শিকাগোতে প্রথম দিন যে অবস্থা হয়েছিল। যেরকম ভাবে ভ্রমণ শুরু করেছিলাম. সেরকম ভাবেই শেষ করছি। তাতে অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই। নিঃস্বের তো শৃঙখল ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় থাকে না!

কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। ভিসায় ছাপ পড়া মানেই আমি এখন কার্যত ফ্রান্সের বাইরে। মার্গারিটও আজই একটু বাদে বাবা-মা'র কাছে ফিরে

যাবে। কাস্টমস্ বেরিয়ার-এর ঠিক পাশেই আমরা একটা বেঞ্চে বসে আছি। আমি হাসতে হাসতে ওকে শোনাচ্ছি, আমার প্রথমবার এই বিমান বন্দরের অভিজ্ঞতা। মার্গারিটও বলছে কাস্টমস্ সম্পর্কে অনেক মজার গল্প।

এক সময় বুঝলাম, আর বেশী সময় নেই। ওকে বললাম, 'আমার চোখের দিকে তাকাও! এবার বলো, একদম মন খারাপ্ করবে না!'

মার্গারিটও হাসি মুখে বললো, 'তুমিও আমার চোখের দিকে তাকাও। এবার বলো, একদম মন খারাপ করবে না।

—মার্গারিট, আমরা হাসি মুখে বিদায় নেবো!

—নীল, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের।

ফ্লাইট নম্বর ধরে ডাক দিয়েছে। এবার যেতে হবে। সত্যিই আমি ফিরে যাচ্ছি? এক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, মার্গারিটের হাসি-মুখ দেখেই সামলে নিলাম। ও যদি ঠিক থাকতে পারে, আমি পারবো না? উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলি মার্গারিট। অ রেভোয়া। দু'তিন বছরের মধ্যে আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবো।'

—আমিও কলকাতায় যাবো। দু'তিন বছরের মধ্যেই। মন খারাপ করবে না?

—না। তুমি?

—দেখো, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো, একটুও কাঁপছে?

একজন লোক এসে তাড়া দিল। আমি মার্গারিটের গালে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

নিচে নেমে এসে রানওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, ওপরে বারান্দায় একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিট। হাসিমুখে বারবার হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে আমার দিকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমিও উত্তর দিলাম কয়েকবার পেছন ফিরে ফিরে। তারপর বিশাল প্লেনের গর্ভে ঢুকে গেলাম।

ভেতরটায় বেশ গুমোট। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, রুমাল বাইরে রাখতে ভুলে গেছি। ইস, মার্গারিট জামা-প্যাণ্ট গুছিয়ে দেবার সময় মনে রাখেনি রুমালের কথা। যাক, তবু জানালার কাছে সীট পাওয়া গেছে। ওপরের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে গুছিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে কি মার্গারিটকে দেখা যায় এখনো?

ও কি? কি দেখছি? দূরে এয়ারপোর্টের বারান্দায় মার্গারিট রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। দু'জন লোক চেপে ধরে আছে তার দু' হাত। আকুলি-বিকুলি করছে মার্গারিট। তার তন্বী শরীরটা যেন ঝড়ের মধ্যে একটা ফুল গাছ। কিছু না ভেবেই আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। বিকৃত গলায় কি যেন বললাম। সহযাত্রীরা অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। আর তক্ষুনি দৌড় শুরু করলো বিমানটা।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ঝড়ে যেন আমার শরীরটা কাঁপাচ্ছে! নিজেকে সামলাতে পারছি না, দরদর করে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। ইস, রুমাল নেই, মুছে ফেলতে পারছি না, অন্য লোকেরা ভাবছে কি! পাশের লোকটি হাঁ করে চেয়ে আছে। একবার সে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে আপনার?

উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। শৈশবের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে আমি আবার কাঁদছি। নির্লজ্জের মতন। আমার হেঁচকি উঠে যাচ্ছে। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছেও সে কান্না শেষ করা যায় না!

আবার জানালা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলাম। আর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে শুধু মেঘ। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি একলা...আর এ কি অসম্ভব একাকীত্ব, বুক যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে—মার্গারিট, আমি আছি, তুমি আমার দিকে একবার তাকাও, চোখে চোখ রাখো, আর একবার বলো, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের!

—